অবিনশ্বর-সিরিজ

উপহার—



অবিনশ্বর সিরিজ

রূপায়িত করেছেন, চিত্রশিল্পী—

শ্রী পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

পরিচালনা—

শ্রীশরৎচন্দ্র পাল

('কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির'-প্রতিষ্ঠাতা)

১৩৬৭

শরৎ • সাহিত্য • ভবন

গ্রন্থকারের নিবেদন

আজকে যারা আমাদের দেশে কিশোর-কিশোরী, তাদের একটা মস্ত-বড় সৌভাগ্য, তারা তাদের চোখের সামনে দেখলো, এই আমাদের দেশ, এই আমাদের ভারতবর্ষ, কিভাবে শতাব্দীর অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে তার স্বাধীনতা অর্জ্জন করলো। আজ আমরা স্বাধীন ভারতবর্ষের সন্তান।

কিন্তু কাগজে-কলমে স্বাধীনতা পাওয়া আর স্বাধীন হওয়া এক জিনিস নয়। মুখে ভগবানের কথা বলা আর জীবনে ভগবানকে পাওয়া এক জিনিস নয়। আজ কাগজে-কলমে আমরা যে স্বাধীনতা পেলাম, তাকে আমাদের জীবনে সত্য ক'রে তুলতে হবে। আমাদের স্বাধীন হতে হবে। সে কাজ এখনো বাকি পড়ে রয়েছে। সেই আমাদের সাধনা।

তাই আজকের যারা কিশোর-কিশোরী, তাদের ওপরই এক বিরাট দায়িত্ব আপনা থেকে এসে পড়েছে, এই বিরাট দেশকে তার শত-শত যুগের মর্য্যাদা আর ঐশ্বর্য্যের অনুযায়ী নতুন ক'রে আবার গড়ে তুলতে হবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী যে-ভারতবর্ষ, আমাদের জননী-জন্মভূমি, আমাদের প্রত্যেকের কর্ম্ম-সাধনায় তাকে আবার সেই বিশ্ব-বিশ্রুত মহিমায় মণ্ডিত ক'রে তুলতে হবে।

তার জন্যে সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন দেশকে জানা। দেশকে ভালোবাসা। দেশকে না জানলে ভালোবাসা যায়না। এই ছোট্ট বইটির একমাত্র লক্ষ্য হলো, সেই তোমাদের জননী-জন্মভূমির প্রতি তোমাদের ভালোবাসাকে জাগিয়ে তোলা। যদি তা জাগাতে পারি, তাহলেই নিজেকে সার্থক মনে করবো।

ন।

ইতি ওহাসের

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃ .ভালী নিজের

.ম্ম দেয়।


সূচীপত্র

আমার বাংলা



গণ-তন্ত্রের জন্মদাতা

আমরা আজ ভুলে গিয়েছি, এই বাঙালীই একদিন ভারতবর্ষে প্রথম গণ-তন্ত্রের প্রবর্ত্তন করেছিল। আজ থেকে প্রায় শত যুগ আগে সারা বাংলাদেশের মধ্যে ঘোর অরাজকতা আসে। সমস্ত দেশ ছোট-ছোট বিভিন্ন রাজার ঝগড়ায় ভ'রে যায়। প্রত্যেকেই নিজেকে রাজা ব'লে ঘোষণা করে এবং প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায় করতে চেষ্টা করে। প্রজারা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, তারা ঠিক করতে পারেনা, কাকে কর দেবে। সারা দেশ অরাজকতায় ভ'রে ওঠে! জোর যার, সেই কোনোরকমে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতো। তখন তারা সকলে মিলে ঠিক করলো, তাদের ভিতর থেকেই একজন যোগ্য লোককে তারা নিজেরাই নির্ব্বাচন করবে এবং সে-ই হবে সমগ্র দেশের শাসক। এইভাবে সেদিন তারা তাদের মধ্যে থেকেই গোপাল ব'লে একজন লোককে নির্ব্বাচন করে। এই গোপাল থেকেই বাংলার ইতিহাসের গৌরবের আরম্ভ। সেদিন বাঙালী নিজের প্রতিভা থেকেই গণ-তন্ত্রের জন্ম দেয়।

আমার বাংলা



আর্য্য-সভ্যতার সমবয়সী

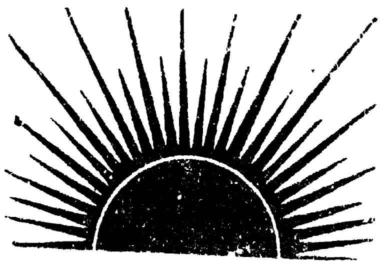
গত যুগেও আমাদের মধ্যে একটা ধারণা ছিল যে, বাঙালীদের সভ্যতার ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়। কিন্তু আজ এ ধারণা যে ভুল, তা ইতিহাসে প্রমাণ ক'রে দিয়েছে। আর্য্যরা যখন উত্তর-ভারতে তাদের বিশেষ সভ্যতা নিয়ে আগমন করে, তখনও এই দেশে বঙ্গ-সভ্যতার একটা স্বাতন্ত্র্য ছিল। মহাভারতেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তুর্য্যোধনের পক্ষে বঙ্গদেশের রাজা বিপুল হস্তী-সৈন্য নিয়ে যোগদান করেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে অসীম বীরত্ব দেখিয়ে প্রাণত্যাগ করেন। তাই আমরা দেখতে পাই, সেই প্রাচীন যুগেও বাংলার একটা নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ছিল···একটা প্রাচীন সভ্যতা ছিল। কত দিনের পুরনো এই সভ্যতা? খৃষ্ট জন্মাবার দেড়হাজার বছর আগেকার প্রাচীন মিশরের "মমীতে" দেখা গিয়েছে, যে, তা ভারতীয় 'মসলিনে' আবৃত। ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র বাংলাতেই এই মসলিন তৈরী হতো। সুতরাং সাড়ে-তিন হাজার বছর আগে বাংলার তৈরী 'মসলিন' মিশরে গিয়েছে।

আমার বাংলা



স্বাধীনতা ও বিদ্রোহের জন্মভূমি

আর্য্যরা যখন সারা ভারতবর্ষকে তাদের ধর্ম্মে আর তাদের সামাজিক-শাসনে বশীভূত করে, তারা পারেনি একমাত্র বাংলাকে। তাই তাদের শাস্ত্রে সেদিন তারা বাঙালীকে অস্পৃশ্য ক'রে রেখেছিল। বলেছিল, যে বাংলায় যাবে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। বাংলা তাতে দমে যায়নি। তাই আর্য্য-ধর্ম্মের মধ্যে যখনই বিপ্লব দেখা দিয়েছে, সে বিপ্লব জন্মেছে—বাংলাদেশে। বাংলাদেশেই বৈদিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়। হিন্দু-ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী সাংখ্যকার কপিলমুনি, এই বাংলাতেই জন্মগ্রহণ করেন। আর্য্য-পুরোহিতেরা যখন তাঁদের মন্দির আঁকড়ে প'ড়ে থাকতেন, তখন এই বাঙালী বৌদ্ধ-পণ্ডিতেরাই সমুদ্র পেরিয়ে, পাহাড় ডিঙিয়ে দেশে—দেশান্তরে জ্ঞানের আলোক বিতরণ করেন। হিন্দু-মুসলমান রাজারা যখন যুদ্ধ করেছে, তখন দুঃসাহসী বাঙালী বাউল-কবিরাই তাদের অন্তরের স্বাধীনতার কথা, সর্ব্বমানবের মিলনের কথা গানের মধ্যে প্রচার করেছে।



আমার



চির-দুঃসাহসিক যার সন্তান

ভারতবর্ষের লোক যখন বাইরের জগতের খবর রাখতো না, তখন দুঃসাহসী বাঙালীরাই ভারতবর্ষের বাইরে নানান দেশে হিন্দু আর বৌদ্ধ-সভ্যতাকে নিয়ে যায়। আমাদের রাজার ছেলে বিজয়সিংহকে যেদিন রাজা রাজ্য থেকে বিতাড়িত ক'রে দিলেন, সেদিন সেই দুরন্ত ছেলে, তারই মতন কয়েকজন দুঃসাহসিক বাঙালীকে সঙ্গে নিয়ে সমুদ্র-পথে অজানা দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। এবং একদিন সেই মুষ্টিমেয় বাঙালী দূর বিদেশে গিয়ে নতুন ক'রে রাজ্য-স্থাপনা করতে পেরেছিল। অশীতিপর বৃদ্ধ বাঙালী দীপঙ্কর পায়ে হেঁটে হিমালয় পার হয়ে তিব্বতে, চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন, বাঙালীরাই প্রাচীন-ব্রহ্মে গিয়ে খাটন শহর গ'ড়ে তোলেন, যবদ্বীপে আর বরবুদুরে বিশাল মন্দির তৈরী ক'রে তার গায়ে রামায়ণ আর মহাভারতের কাহিনীর ছবি পাথরে খোদাই ক'রে রেখে আসে। সে-বিস্ময়কর মন্দির আজও বেঁচে আছে—প্রাচীন বাঙালীর দুঃসাহসিকতা আর সৌন্দর্য্যজ্ঞানের প্রতীকরূপে।

আমার বাংলা



দিগ্বিজয়ী যার ভাষা

বাংলার পরম গর্ব্বের বিষয় হলো, তার ভাষা। দেড়হাজার বছর ধ'রে একাদিক্রমে এই ভাষায় যে কাব্যের নদী প্রবাহিত হয়ে এসেছে, জগতে তার তুলনা নেই। এমন মধুর কাব্যের ধারা,এমন অব্যাহতভাবে জগতের আর কোনো ভাষায় দেখা যায়না। বৌদ্ধগান ও দোঁহায় যার আরম্ভ, রবীন্দ্রনাথে এসে তার চরম পরিণতি হয়েছে। এই বাংলা ভাষা, বাংলা অক্ষর, শত-শত বছর আগে, হিমালয় পেরিয়ে জাপানে, চীনে গিয়েছিল। জাপানে হরিউজীর বৌদ্ধমঠে এখনো বাংলা-অক্ষরে-লেখা, ধর্ম্ম-গ্রন্থের পূজা হয়। বিবেকানন্দ জাপানে গিয়ে দেখেছিলেন, এক প্রাচীন ভগ্নমন্দিরের শীর্ষফলকে বাংলা অক্ষরে "ওম্ নমঃ" লেখা রয়েছে। চীনের এক প্রাচীন মঠের ভেতর দেখেছিলেন, বাংলা-হরফে লেখা প্রাচীন পুঁথি। একদিন পণ্ডিতলোকেরা এই ভাষাকে অবজ্ঞা করতেন, সংস্কৃত ছিল তাঁদের ভাষা। বাংলা ছিল জনসাধারণের ভাষা। বাংলার কবিরা এই জনসাধারণের ভাষাকে ক'রে তুলেছেন মানব-মনের চরম ভাষা।

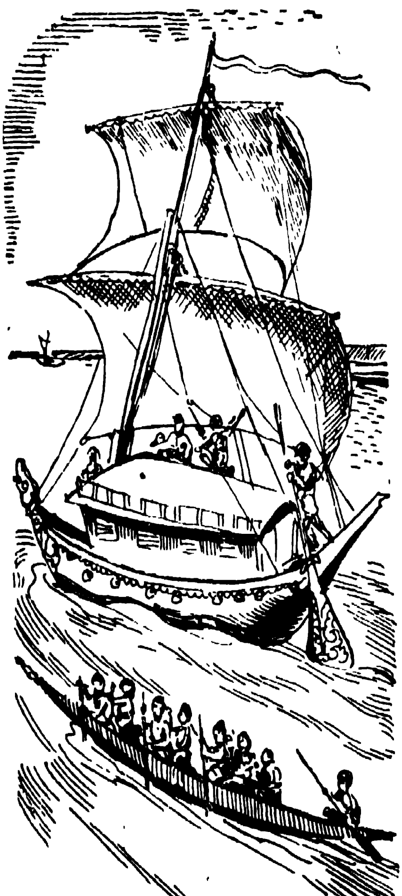
আমার বাংলা



বীর যোদ্ধার জননী

ইংরেজ এসে বাঙালীর হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিয়ে প্রচার করে যে, বাঙালী রণ-বিমুখ জাত! আজ বাংলার ঐতিহাসিক, বাঙালীর প্রাচীন ইতিহাসে খুঁজে দেখেছে যে, বাঙালী ভারতের যে-কোনো জাতের যোদ্ধার সমান যোদ্ধা ছিল। বাঙালী-যোদ্ধার বীরত্বে একদিন কাশ্মীরের মাটি পর্য্যন্ত রাঙা হয়েছিল। কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্য গৌড়ের বীর রাজাকে অতিথিস্বরূপ দিয়ে যান। কিন্তু সেখানে তিনি নির্ম্মমভাবে নিহত হন। এই জঘন্য হত্যা-কাণ্ডের প্রতিশোধ নেবার জন্যে একদল বাঙালী-সৈনিক গৌড় থেকে ছদ্মবেশে কাশ্মীরে যায় এবং কাশ্মীরের রাজধানীতে ললিতাদিত্যের বৈরাট সৈন্যকে উপেক্ষা ক'রে বাঙালী-যোদ্ধারা অস্ত্র-হাতে সেদিন সেই জঘন্য অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্যে রাজার বিষ্ণুমন্দির আক্রমণ করে। কাশ্মীরের ঐতিহাসিক কহ্লন-কবি সেই বাঙালী-যোদ্ধাদের বীরত্বের কথা বর্ণনা ক'রে লিখেছেন, জগতে এ বীরত্ব, এ সাহসিকতার তুলনা নেই।

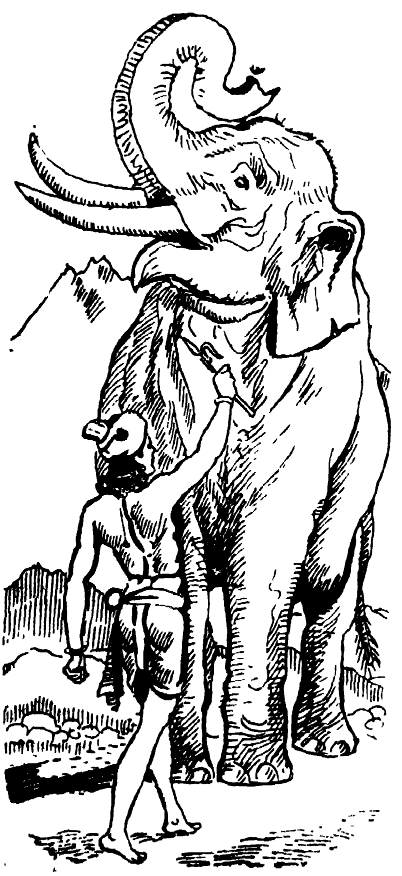
আমার বাংলা



নাবিক আর নৌকার দেশ

একদিন বাঙালীর নিজস্ব নৌবহর ছিল, বাংলার তৈরী জাহাজের জন্যে বাইরে থেকে অর্ডার আসতো। তাম্রলিপ্তের বন্দরে রোমের জাহাজ এসে ভিড়তো ; ইতালীর বন্দরে বাঙালী-নাবিক সমুদ্র-তরঙ্গ মন্থন ক'রে উপস্থিত হতো। সমুদ্র-পথে সেদিন বাঙালী নিজেদের তৈরী জাহাজে বাণিজ্য ক'রে বেড়াতো। প্রাচীন বাংলা-ভাষায় নৌ-বিজ্ঞানের নিদর্শন রয়ে গিয়েছে। জাহাজের প্রত্যেক কাজের জন্যে আলাদা-আলাদা নাম ছিল, দিশারু, তারাবিদ্, কর্ণধার, পবনবেত্তা নাউড্যা, যানশিল্পী। বাংলার মধ্যযুগের কাব্যের অধিকাংশ নায়কই বড়-বড় নাবিক। পনেরো ষোলোখানা জাহাজ একসঙ্গে ক'রে তারা বাণিজ্যে বেরুতো। দৈর্ঘ্য হিসাবে নৌকার নাম হতো—বিশহাতী, বাইশা, পঁচিশা, আঠাইশা। গড়ন হিসেবেও নানাজাতের নৌকা ছিল, দোণা, হনি, ডিঙি, ভেলা, বালাম, ছিপ, ময়ূরপঙ্খী। ইতিহাসে অনেক জাহাজের নাম অমর হয়ে আছে,—মধুকর, হংসমুখী, সিংহমুখী, নাগফণি, শঙ্খচূড়, দুর্গাবর, রণজয়, নরভীমা ইত্যাদি।

আমার বাংলা

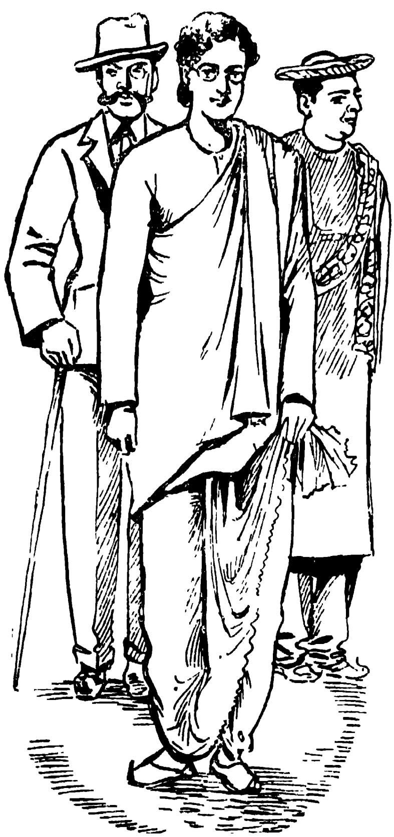


বনের পশুকে বশ করেছিল

প্রাচীন বাঙালীর সংগঠন-শক্তির একটা বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়, তার হস্তী-পালন-বিদ্যায়। বনের পশুকে শিক্ষিত ক'রে তুলে, তাকে মানুষের কাজে লাগানো, বিশেষ সংগঠন-প্রতিভার প্রয়োজন হয়। বিশেষ ক'রে সেই পশুকে শিক্ষিত ক'রে, যুদ্ধের কাজে লাগানো। হাতির মতন প্রাণীকে সুশিক্ষিত ক'রে, যুদ্ধে ব্যবহার করা বিশেষ বৈজ্ঞানিক-শিক্ষার প্রয়োজন।

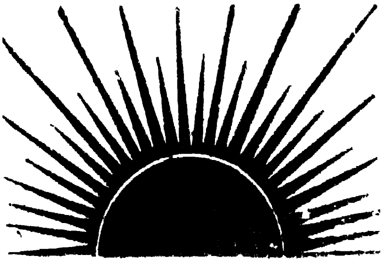
বাংলাদেশের প্রাচীন রাজাদের সেনা-বাহিনীর সঙ্গে থাকতো, শিক্ষিত হস্তীবাহিনী। বাঙালীই ভারতবর্ষে প্রথম সেই বিশাল ও বন্যজন্তুকে মানুষের কাজে শিক্ষিত ক'রে তোলে। এবং সেইসঙ্গে এক নতুন বিজ্ঞানের সৃষ্টি করে,—হস্তী-চিকিৎসা। সেই সম্বন্ধে একটা স্বতন্ত্র শাস্ত্র তারা গ'ড়ে তোলে। অন্য জাতের লোক যখন বনে হাতি শিকার ক'রে বেড়াতো, বাঙালী তখন হস্তী-চিকিৎসা করতে জানতো। এইসূত্রে একজন বাঙালী ঋষির নাম পাওয়া যায়, পুলকাপ্য তাঁর নাম। তিনিই জগতে প্রথম হস্তী-বিজ্ঞান লেখেন।

আমার বাংলা

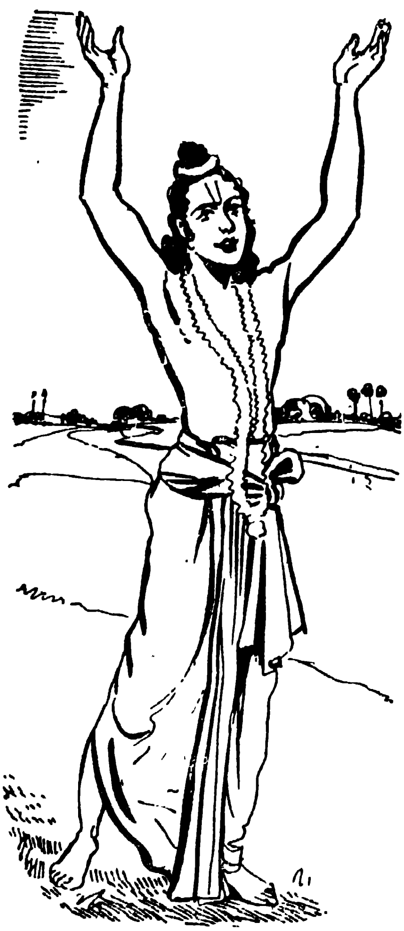


স্বতন্ত্র প্রতিভার দেশ

বাংলাদেশ নতুন-কিছু গ্রহণ করতে সব-সময়েই প্রস্তুত, কিন্তু কোনো জিনিসই সে অন্ধভাবে গ্রহণ করেনা। তার নিজস্ব এমন একটা প্রতিভা আছে, যা দিয়ে সে বাইরের জিনিস নিজের ক'রে নেয়। আর্য্য-সভ্যতা থেকে আরম্ভ ক'রে, ইংরেজী-সভ্যতা পর্য্যন্ত সমস্ত সভ্যতাকেই বাংলাদেশ নিজের মতন ক'রে গ্রহণ করেছে। তাই ভারতবর্ষে যখন ইংরেজী-সভ্যতা এলো, বাঙালীই সর্ব্বপ্রথম তার ভেতর থেকে পাশ্চাত্য-সভ্যতাকে গ্রহণ করলো এবং তার বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহও এই বাংলার মাটিতেই জন্মগ্রহণ করে। সেইজন্যে বাঙালীর চরিত্রে এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যার জন্যে জগতের অগ্রগামী জাতিদের সঙ্গে সমান মর্য্যাদা সে দাবি করতে পারে। বাঙালীর এই অসাধারণ প্রতিভার নানা কাহিনী তার প্রাচীন ইতিহাসে রয়ে গিয়েছে। যেদিন মিথিলা তার ন্যায়ের পুঁথি মিথিলার বাইরে যেতে দিতোনা, তখন একজন বাঙালী-ছাত্র মিথিলার সমস্ত ন্যায়শাস্ত্র মুখস্থ ক'রে বাংলায় নিয়ে আসে।



আমার বাংলা



প্রাণের ধর্ম্মই তার ধর্ম্ম

বাংলাদেশ চিরকাল প্রাণ-ধর্ম্মের পূজারী। শাস্ত্রের অনুশাসনের চেয়ে প্রাণের ভক্তিকেই সে বড় ব'লে জানে। প্রাণের দাবির চেয়ে বড় দাবি তার কাছে আর কিছু নেই। চৈতন্যদেব তাঁর সময়ে বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তিনি যেদিন বুঝলেন যে, শুধু মস্তিষ্ক দিয়ে ভগবানকে পাওয়া যায় না, সেদিন চৈতন্যদেব পুঁথিপত্র সমস্ত গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন দিয়ে শুধু প্রাণের আবেগে, ভালোবাসায়, সকলকে এক হতে বললেন। তাই স্বাধীনতার যুগে বাঙালীর ছেলে সকলের আগে এগিয়ে এলো তার প্রাণ নিয়ে।

মৃত্যুভয়ে যখন সারা ভারতবর্ষ অন্ধকারে লুকিয়ে ছিল, তখন এই বাঙালী-ছেলেই হাসতে-হাসতে ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ-বিসর্জ্জন দিয়েছিল। তাই পুরনো-সংস্কার জাতিভেদ, আর পুরোহিতের আধিপত্যের বিরুদ্ধে স্বামী বিবেকানন্দ এসে দাঁড়ালেন এই বাংলাদেশে। অমর-প্রাণের বাণী নিয়ে এই মাটিতেই জন্মালেন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ।

আমার বাংলা



মানবতার পূজারী

বাংলার প্রাণ-ধর্মের জন্যেই বাংলা অতি প্রাচীনকাল থেকে মানবতার পূজা ক'রে আসছে। আজ সারা জগতে, নানা দ্বন্দ্ব আর নানা সংঘর্ষের মধ্যে যে-মানবতার আদর্শ বড় হয়ে উঠেছে, বাংলা বহু যুগ আগে-থাকতেই সেই আদর্শের সন্ধান জগৎকে জানিয়ে দিয়েছিল। বাংলার কবিই একদিন মানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্রের রূপদান করেন ঃ

'শুন রে মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য,
তাহার উপরে নাই।'

মানবতার এত-বড় আদর্শ, এমন সহজ আর স্বচ্ছভাবে জগতের আর কোনো ভাষায় নেই। বাংলার অর্দ্ধশিক্ষিত বাউল-কবিদের মুখে মানবতার যে-সব গান ফুটে ওঠে আজ য়ুরোপের বড়-বড় দার্শনিকেরা তা শুনে অবাক হয়ে যাচ্ছেন। বড়-বড় শিক্ষিত হিন্দু আর মুসলমান যা পারেন নি, বাংলার গেঁয়ো বাউল-কবিরা তাই পেরেছিলেন। তাঁদের একতারাতে একটি মাত্র সুর ছিল, সে সুর হলো—মানবতার সুর।





বিদ্যা আর বুদ্ধির ধাত্রী

বাঙালীর মেধা আর মস্তিষ্ক—জগতে অগ্রগণ্য ! মিথিলার পণ্ডিতরা তাঁদের পুঁথি অন্য কারুর হাতে দিতেন না। বিশেষ ক'রে, বাঙালীদের। বাঙালীরা পাছে জানতে পারে, এইজন্যে সর্ব্বপ্রযত্নে গোপন রাখতেন, কিন্তু বাঙালী তরুণ-ছাত্র রঘুনাথ—মিথিলার টোল থেকে সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ ক'রে বাংলায় নিয়ে আসে। এই বাংলাদেশের পণ্ডিতদের জন্যেই ছিল নালান্দা আর বিক্রমশীলার খ্যাতি। এই বাঙালী-পণ্ডিতেরাই হিমালয় পেরিয়ে চীনে, জাপানে গিয়ে জ্ঞান বিতরণ করে। নবদ্বীপ একদিন সমগ্র ভারতে এক নতুন ন্যায়-শাস্ত্রের প্রচার করে। ইংরেজ-আমলে এই বাঙালীই সকলের আগে ইংরেজী-বিদ্যায় ইংরেজের সমকক্ষ হয়। ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাদেশের কবিই 'নোবেল-প্রাইজ' পান এবং বিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্রই প্রথম ভারতবাসীর নাম বিশ্বের বিজ্ঞান-সভায় প্রতিষ্ঠিত করেন। ইংরেজ-আমলে বাঙালীরাই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দীপ জ্বালিয়ে তুলেছে।

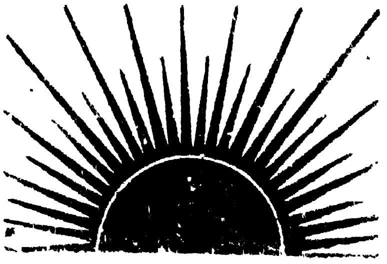
আমার বাংলা





ভারতের পথপ্রদর্শক

নতুন যুগে বাঙালীই ছিল ভারতের পথ-প্রদর্শক। শুধু সাহিত্য-বিজ্ঞানে নয়, বাঙালীর প্রতিভাই সেদিনও পর্য্যন্ত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে, বিভিন্ন সামন্ত-রাজাদের রাজ্যে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার ক'রে ছিল। নেপাল ও কাবুলের বন্দুকের কারখানার স্রষ্টা, বাঙালী-ক্যাপটেন--রাজকৃষ্ণ কর্ম্মকার, জয়পুরের মন্ত্রী ছিলেন—বাঙালী হরিমোহন সেন, কাশীর রাজার মন্ত্রী ছিলেন—জয়নারায়ণ ঘোষাল, লক্ষ্ণৌ-এ ছিলেন—দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, পাঞ্জাবে—গোলকনাথ চট্টোপাধ্যায়, হায়দ্রাবাদে শিক্ষার অধ্যক্ষ—অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়,টাটার লৌহ-কারখানার পশ্চাতে—প্রমথনাথ বসু, এইভাবে সারা ভারতবর্ষে সেদিন ছিল বাঙালী-প্রতিভারই আধিপত্য। হিমালয়ের উচ্চতম চূড়া 'এভারেষ্ট' যদিও একজন ইংরেজের নাম বহন করছে, কিন্তু এই পর্ব্বতচূড়া প্রথম আবিষ্কার করেন—রাধানাথ শিকদার। বুদ্ধিতে অপরাজেয় এই বাঙালী-জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করার জন্য আমরা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করি।



আমার বাংলা



তোমায় আমি ভালবাসি

প্রত্যেক বাঙালী-ছেলেমেয়ের অন্তরে ধ্বনিত হোক, বাংলার অমর-কবির বাণী, 'হে আমার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।' যদিও আজ ঘন মেঘভার তার আকাশ ছেয়ে আছে, যদিও আজ অভাবে, অন্যায়ে তার অন্তর ব্যথিত, সংক্ষুব্ধ, তবুও তার অবিনাশী প্রাণ মেঘমুক্ত সূর্য্যের মতন আবার একদিন সমূজ্জ্বল হয়ে উঠবে। রামমোহনের দেশ, বঙ্কিমের দেশ, ঠাকুর রামকৃষ্ণের লীলাভূমি, বিবেকানন্দ-অরবিন্দের ধাত্রী, রবীন্দ্রনাথের জননী, চিত্তরঞ্জন আর সুভাষচন্দ্রের জন্মভূমি, সে কখনও অন্ধকারে ডুবে যেতে পারেনা। এই বাংলার মাতৃ-মূর্ত্তির ধ্যানে কত তরুণ-তরুণী জীবন বিসর্জ্জন দিয়েছে কত প্রাণ আত্মাহুতি দিয়েছে, তাদের জীবনব্যাপী সে কঠোর সাধনা কখনই ব্যর্থ হতে পারে না।

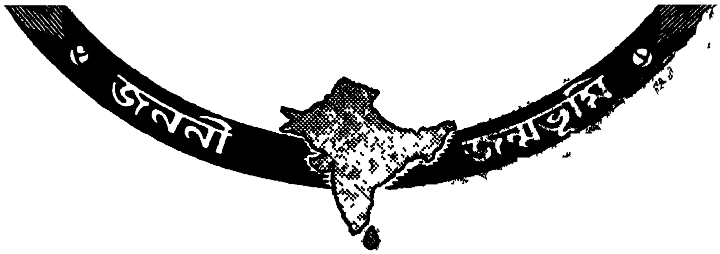
তোমাদের একাগ্র কামনায়, হে বাংলার কিশোর-কিশোরী, তোমাদের জীবনেই আবার জেগে উঠুক ভারত-অঙ্ক-মণি তোমার-আমার এই জন্মভূমি। বন্দে মাতরম্!



স্থবির শীলভদ্র

গয়া থেকে কিছু দূরে বিহার লাইট-রেলওয়ের বড়গাঁ ব'লে একটা ছোট্ট ষ্টেসন আছে। সেই বড়গাঁ-গ্রামের দক্ষিণে, মাটির তলা থেকে প্রাচীন-ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় 'নালন্দা'র ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। যীশুখৃষ্ট জন্মাবার বহু পূর্ব্ব থেকে দ্বাদশ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই নালন্দা মহা-বিহার বা বিশ্ববিদ্যালয় সেই সময়কার মগধের রাজধানী-রাজগৃহের কাছেই অবস্থিত ছিল।

এত-বড় শিক্ষা-কেন্দ্র ভারতে আর হয়নি এবং জগতে আজ পর্য্যন্ত সবচেয়ে প্রধান যে-সব শিক্ষা-কেন্দ্র আছে, নালন্দার নাম তাদের সঙ্গে উচ্চারিত হয়। দেশ-দেশান্তর থেকে, সমুদ্র পেরিয়ে, হিমালয়ের মত পাহাড় উলঙ্ঘন ক'রে, দলে-দলে ছাত্র আসতো, নালন্দায় অধ্যয়ন করবার জন্যে। নালন্দা ছিল ভারতের জ্ঞান-শিক্ষা এবং বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান। আজ নালন্দার দীর্ঘ ইতিহাসের যে-সময়কার কাহিনী বল্‌ছি, সে-সময় নালন্দার গৌরবের যুগ। দশ হাজার ছাত্র তখন (৬৩৭-৪২খৃঃ) নালন্দা-বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে অধ্যয়ন করেন। এত-বড় বাসো-



পযোগী বিশ্ববিদ্যালয় জগতে আর হয়নি। নালন্দার যিনি অধ্যক্ষ হতেন, ভারতের যে-কোনো প্রদেশের রাজা তাঁর কাছে মাথা নত করতে দ্বিধা করতেননা।

এখানকার অধ্যাপক এবং ছাত্ররা ভগবান বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম্ম অনুসরণ ক'রে আড়ম্বরহীন তপস্বী এবং ব্রহ্মচারীর মত জীবন যাপন করতেন। ভিক্ষুর পীতবাস প'রে, কম্বল মাত্র সম্বল ক'রে সেদিন তাঁরা সমগ্র ভারত, চীন, জাপান, শ্যাম, জাভা, কম্বোজ প্রভৃতি দেশেব কোটী-কোটী নব-নারীর জীবনে যে পরিবর্ত্তন এনে দিয়েছিলেন, আজও তাব মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রয়ে গিয়েছে। নিরস্ত্র লোকের এত-বড় দিগ্বিজয় এবং এত স্থায়ী বিজয়, জগতের যোদ্ধাদের ইতিহাসেও দেখা যায়না।

এই মহা-বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যিনি জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ছিলেন, প্রাচীন-ভারতের সেই অদ্বিতীয় পণ্ডিত, নালন্দা মহা-বিহারের অধ্যক্ষ মহাস্থবির শীলভদ্রের কাহিনী এখানে তোমাদের বলবো।

তিনি ছিলেন, সমতটের রাজার ছেলে। প্রাচীনকালে বাংলার দক্ষিণ-ভাগকে সমতট বলতো। রাজার ছেলে হয়ে সিংহাসন ছেড়ে তিনি পায়ে হেঁটে বেবোলেন জ্ঞান সংগ্রহের জন্যে।

সমস্ত ভারতবর্ষ পায়ে হেঁটে পবিভ্রমণ ক'বে, যেখানে যা-কিছু শিক্ষনীয় পেয়েছিলেন, সমস্ত শিক্ষা ক'রে, ত্রিশ বছর বয়সে একদিন নালন্দা-বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারদেশে এসে উপস্থিত হলেন। তখন নালন্দা-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন, বোধিসত্ত্ব ধর্ম্মপাল। বোধিসত্ত্ব ধর্ম্মপালের কাছে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের দীক্ষা গ্রহণ করলেন। অধ্যাপকরূপে তিনি নালন্দা মহা-বিহারে যোগদান ক'রে জ্ঞানদাতা ভিক্ষুর ব্রত গ্রহণ করলেন। সমতটের রাজ-সিংহাসন প'ড়ে রইলো দূরে।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি অবশিষ্ট সমস্ত শাস্ত্র-অধ্যয়ন শেষ করলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের ব্যাখ্যায় তিনি বোধিসত্ত্ব ধর্ম্মপালের মতই বরণীয় হয়ে উঠলেন। সেই সময় দক্ষিণ-ভারত থেকে এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নালন্দার বৌদ্ধ-অধ্যক্ষের সঙ্গে

ধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্ক করবার জন্যে মগধের রাজদরবারে উপস্থিত হন। তিনি ধর্ম্মপালকে তর্ক-যুদ্ধে আহ্বান করলেন। রাজা ধর্ম্মপালকে ডেকে পাঠালেন।

ধর্ম্মপাল তর্ক যুদ্ধে প্রস্তুত হয়ে যখন যাবার উদ্যোগ করছেন, তখন শীলভদ্র এসে বললেন, আপনি কেন যাবেন?

ধর্ম্মপাল উত্তর দিলেন, বৌদ্ধধর্ম্মের সূর্য্য অস্তমিত হতে চলেছে, চারিদিকে বিধর্ম্মীরা মেঘের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের দূর না করতে পারলে স্বধর্ম্মের উন্নতি নেই!

শীলভদ্র তাঁকে নিরস্ত ক'রে বললেন, আপনি বৃদ্ধ হয়েছেন, আপনি থাকুন, আপনার পরিবর্ত্তে আমি যাচ্ছি।



দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হেসে উঠলেন, এই বালকের সঙ্গে কি বিচার করবো!

ধর্ম্মপাল সম্মত হওয়াতে শীলভদ্র তাঁর প্রতিনিধিরূপে সেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের সঙ্গে বিচার-যুদ্ধের জন্যে মগধের রাজসভায় উপস্থিত হলেন।



শীলভদ্রকে দেখে বৃদ্ধ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হেসে উঠলেন, এই বালকের সঙ্গে কি বিচার করবো !

কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের এ-রকম অবস্থা হলো যে, সেই বালকের কোনও যুক্তি তিনি খণ্ডন করতে পারলেননা, কোনও কথার উত্তর দিতে পারলেননা, অবশেষে লজ্জায় অধোবদনে তিনি রাজসভা ত্যাগ ক'রে গেলেন। শীলভদ্রের পাণ্ডিত্যে রিমুগ্ধ হয়ে মগধের রাজা বললেন, আপনার পাণ্ডিত্যে আমি বিমুগ্ধ হয়েছি, আমি আপনাকে আপনার পাণ্ডিত্যের অর্ঘ্যস্বরূপ একটি নগর দান করছি, আপনি গ্রহণ ক'রে আমাকে ধন্য করুন।

জ্ঞান-ব্রত শীলভদ্র মৃদু হেসে বললেন, মহারাজ, আমি কাষায় গ্রহণ করেছি, আমি আপনার নগরী নিয়ে কি করবো ?

কাতর হয়ে রাজা বললেন, ভগবান বুদ্ধ বহুদিন গত হয়েছেন, এখন যদি আমরা গুণের পূজা না করি, তাহ'লে ধর্ম্মরক্ষা পাবে কি ক'রে ? আপনি আমার এ দান অগ্রাহ্য করবেননা।

রাজাকে এতদূর আগ্রহশীল এবং কাতর দেখে শীলভদ্র সেই নগর গ্রহণ করলেন। নগরটি গ্রহণ ক'রে তার রাজস্ব দিয়ে একটি বিরাট সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করলেন এবং সেই নগরের আয় থেকে তা পরিচালিত হতে লাগলো।

জগৎখ্যাত চীন-পরিব্রাজক য়ুয়াং-চুয়াং যখন ভারতবর্ষে এসেছিলেন, তখন মহাস্থবির শীলভদ্র নালন্দার অধ্যক্ষ। জগতের জ্ঞান সাধনার ইতিহাসে য়ুয়াং-চুয়াংএর নাম অক্ষয় হয়ে আছে এবং থাকবে। তাঁরই অসম্ভব সাধনার ফলে একদিন পথহীন হিমালয়ের বুকে পথ জেগে উঠেছিল। হিমালয়ের এপারে আর ওপারে দুটি বিরাট জাতি অতি অন্তরঙ্গভাবে পরস্পর পরস্পরকে জেনেছিল। চীন আর ভারত, জগতের এই দুই সর্ব্বোত্তম প্রাচীন-সভ্যতার মিলনের পুরোহিত ছিলেন য়ুয়াং-চুয়াং। কি কষ্ট সহ্য ক'রে তিনি পায়ে হেঁটে ভারতবর্ষের তীর্থে-তীর্থে নগরে-নগরে ঘুরে বিদ্যাশিক্ষা করেছিলেন, আজ আমরা তা ভেবে পাইনা। একখানি



পুঁথি সংগ্রহ করবার জন্যে তাঁকে হাজার মাইল ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। এ ধৈর্য্য, এ নিষ্ঠা আজ কল্পনার জিনিস, কিন্তু সেই ধৈর্য্য এবং নিষ্ঠা নিয়ে য়ুয়াং-চুয়াং ভারতবর্ষের সমস্ত জ্ঞান নিজে আয়ত্ত ক'রে, সঙ্গে বহু গ্রন্থ নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

চীনদেশের বৌদ্ধ-পণ্ডিতদের মধ্যে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ। তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্য একদিন চীন, মঙ্গোলিয়া, জাপান, কোরিয়া ছেয়ে ফেলেছিল।

সেই জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ য়ুয়াং-চুয়াং গুরুর সন্ধানে ভারতে এসে মহাস্থবির শীলভদ্রকে তাঁর উপযুক্ত গুরু ব'লে নির্ব্বাচিত করলেন। শীলভদ্রের পাণ্ডিত্য দেখে য়ুয়াং-চুয়াং তাঁকে দেবতার মত ভক্তি করতেন। তিনি তাঁর অপরূপ ভ্রমণ-কাহিনীতে লিখে গিয়েছেন, নানা দেশে নানা গুরুর কাছে যে-সমস্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন করেও আমার সংশয় দূর হয়নি, শীলভদ্রের সঙ্গে কথা ব'লে আমার সেইসব সন্দেহ দূর হয়েছে।

শীলভদ্র বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম এবং বৌদ্ধ-যোগের সকল তত্ত্ব তিনি অবগত ছিলেন, কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্যের আর-একটু বিশেষত্ব ছিল, তিনি ব্রাহ্মণদের সকল শাস্ত্রেও সমান পণ্ডিত ছিলেন। পাণিনির ব্যাকরণ তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। য়ুয়াং-চুয়াং তাঁর কাছ থেকে সমগ্র বেদ পড়েছিলেন। তিনি দুশোখানি পুস্তক নিজে লিখেছিলেন। বহু দুরূহ শাস্ত্রের টীকা করেছিলেন। এবং পণ্ডিতেরা বলেন—সেইসব টীকার ভাষা অতি পরিষ্কার, সহজ এবং সরল।

শীলভদ্র নিজে জ্ঞান আহরণ করেই সন্তুষ্ট ছিলেননা। তাঁর অন্তরে আরও মহত্ত্বর আদর্শ ছিল। তিনি চেয়েছিলেন, জ্ঞানের মধ্যে দিয়ে দেশ-দেশান্তর সম্মিলিত হোক্। মানুষের তৈরী-করা জাতিতে-জাতিতে পার্থক্য, জ্ঞানের স্পর্শে দূর হয়ে যাক্। এই যে আদর্শ, একে আজ-কাল য়ুরোপের অনুকরণে আমরা বলি, আন্তর্জ্জাতিকতা বা বিশ্বমৈত্রী। শীলভদ্র ছিলেন প্রাচীন-জগতের আন্তর্জ্জাতিকতার একজন শ্রেষ্ঠ পুরোহিত।

য়ুয়াং-চুয়াং-এর পাণ্ডিত্য এবং চরিত্রগুণে নালন্দার অধ্যাপকগণ এতদূর মুগ্ধ



হয়ে যান যে, যখন য়ুয়াং-চুয়াং চীন যাবার জন্যে বিদায় চাইলেন, তখন কেউই তাঁকে চীনে যেতে দিতে চাইলেনা। য়ুয়াং-চুয়াংকে ভারতবর্ষে রাখবার জন্যে তাঁরা চেষ্টা কর্‌তে লাগলেন। কিন্তু শীলভদ্র বললেন, তা হতে পারেনা। চীন এক মহাদেশ। সেখানে জ্ঞানধর্ম্ম-প্রচারের প্রয়োজন আছে। য়ুয়াং-চুয়াং সেই মহাপ্রয়োজন সিদ্ধ করবেন। আত্ম-প্রীতির জন্যে তাঁকে এখানে আবদ্ধ ক'রে রেখে কি লাভ হবে।

সেদিন বাংলাদেশের সেই পণ্ডিতটির জ্ঞানালোকে—হিমালয়ের ওপারে চীনে, জাপানে, কোরিয়ায় এবং মঙ্গোলিয়ায় হাজার-হাজার অন্ধকার ঘরে আলো জ্বলে উঠেছিল।

কিন্তু সে অনেকদিন আগেকার কথা।



দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

এক

আজ থেকে প্রায় হাজার বছর আগেকার কথা। তখন বাংলা এবং বিহারের সিংহাসনে রাজা হলেন—মহীপাল দেবের ছেলে নয়-পাল। সেই সময় বাংলাদেশে এক ভুবন-জয়ী মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। একদা সমস্ত ভারতভূমি তাঁর জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছিল,—দীপের আলোয় যেমন অন্ধকার আলোকিত হয়ে ওঠে। তাই ইতিহাসে তিনি দীপঙ্করশ্রী নামে পরিচিত। তাঁর শ্রী বা সৌন্দর্য্য এইরকম ছিল যে, তিনি যেখানে যেতেন, সেই জায়গাই দীপের আলোয় হেসে উঠতো। জ্ঞানে তিনি সকলের বড় ছিলেন ব'লে তাঁর আর-এক নাম হয়—জ্ঞান-অতীশ। লোকে সাধারণত তাঁকে অতীশ বলেও জানতো। ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে-সব মহাপুরুষের নাম অনন্তকাল পর্য্যন্ত বেঁচে থাকবে, দীপঙ্কর হলেন তাঁদেরই একজন। এবং আমাদের পরম গৌরবের বিষয় যে, তিনি আমাদেরই মত ছিলেন এই বাংলাদেশেরই ছেলে।

হিমালয়ের এপারে ভারতবর্ষ, ওপারে তিব্বত, দুই দেশই জ্ঞানের আলোয়



আলোকিত হয়ে উঠেছিল। আজও তিব্বতবাসীরা দেব অতীশের নাম স্মরণ ক'রে নিত্য প্রণতি জানায়।

হিমালয়ের ব্যবধান দূর ক'রে সেদিন দীপঙ্কর এই দুই দেশকে এক করেছিলেন।

দুই

পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরের এক রাজার ঘরে দীপঙ্কর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মা'র নাম—প্রভাবতী। পিতার নাম—কল্যাণশ্রী। ছেলেবেলায় তাঁর বাপ মা তাঁর নাম রেখেছিলেন—চন্দ্রগর্ভ।

সুখের বিষয়, তিনি যে-বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে-বংশে অর্থের অভাব ছিলনা এবং তাঁরা অর্থকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য মনে করতেন না। কল্যাণশ্রী স্থির করলেন যে, তাঁর পুত্রকে তিনি ধর্ম্মশাস্ত্র এবং অন্য-সব জ্ঞানে সুপণ্ডিত ক'রে তুলবেন।

জেতারী নামে এক অবধূতের কাছে বালক চন্দ্রগর্ভের শিক্ষা আরম্ভ হলো। বিস্ময়ের ব্যাপার, বালক অতি অল্প সময়ের মধ্যে অতি দুরূহ সব গ্রন্থ পড়তে আরম্ভ ক'রে দিলো। কিশোর-কালের মধ্যেই তিনি অধিকাংশ শাস্ত্র প'ড়ে শেষ ক'রে ফেললেন।

সেইসময় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত দেশ ভ্রমণ করতে-করতে তাঁদের দেশে উপস্থিত হন। বালক চন্দ্রগর্ভের সঙ্গে সেই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের শাস্ত্র নিয়ে বিচার হয়। বিচারে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বালকের কাছে পরাজিত হন। এমনি অপূর্ব মেধা ছিল সেই বালকের।

রাজ-পরিবারের সুখ ঐশ্বর্য্য ভোগ করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হলোনা। সেই কিশোর-কালেই তিনি বেরুলেন, বৃহত্তর-জ্ঞানের অনুসন্ধানে। কৃষ্ণগিরির বৌদ্ধ-বিহারে মহাপণ্ডিত রাহুল গুপ্তের কাছে তিনি বৌদ্ধ-ধর্ম্মশাস্ত্র পড়তে



লাগলেন। সেখানকার পাঠ শেষ ক'রে তিনি ওদন্তপুরীর বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে এলেন। সেখানকার প্রধান আচার্য্য, শীল রক্ষিতের সংগৃহীত যে-সব দুষ্প্রাপ্য শাস্ত্র ছিল, তাও শেষ করলেন। চন্দ্রগর্ভের অসামান্য প্রতিভা এবং জ্ঞান দেখে, শীল রক্ষিত তাঁর নাম দিলেন—দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। সেই থেকে তিনি দীপঙ্কর নামে পরিচিত।

তিন

দেখতে-দেখতে তাঁর বিদ্যা এবং ধর্ম্ম-জ্ঞানের কথা ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো।

তিনি সংসারের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ত্যাগ ক'রে বৌদ্ধ-ভিক্ষুর পীত বসন পরিধান করলেন। যেখানে বুদ্ধদেব জ্ঞান লাভ করেছিলেন, সেই বুদ্ধ-গয়ায় মহাবোধি-মঠে তিনি বাস করতে লাগলেন।

সেই সময়ে হঠাৎ চেদী-বংশের কর্ণদেব বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। কিন্তু রাজা নয়পালের কাছে তাঁর ভীষণ পরাজয় হয়। প্রতিদিন তাঁর অসংখ্য সৈন্য নিহত হতে লাগলো।

সেই নিদারুণ লোক-হত্যা দেখে দীপঙ্করের মনে বড় আঘাত লাগলো। তিনি নিজে দূত হ'য়ে, উভয়দলের সঙ্গে কথা ব'লে, যুদ্ধ বন্ধ ক'রে দেন।

সেই সময় নালন্দা-বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি ভারতবর্ষের সীমা ছাড়িয়ে চীনে, তিব্বতে, দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। এত-বড় বিশ্ববিদ্যালয় সে-সময় জগতে আর ছিলনা। দীপঙ্কর নালন্দা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যক্ষ হয়ে দেশ-দেশান্তরের ছাত্রদের জ্ঞান বিতরণ করতে লাগলেন।

হিমালয়ের ওপারে তিব্বতে তাঁর অপূর্ব্ব জ্ঞান-মহিমার কথা তখন আর-একজন লোকের মনে এক তীব্র জ্ঞান-পিপাসা জাগিয়ে তুলেছিল। তিনি হলেন—স্বয়ং তিব্বতের রাজা, যশী হড্। দেশের লোকের অজ্ঞতা দেখে, তাদের মধ্যে



নিদারুণ ধর্ম্মজ্ঞানের অভাব দেখে, সিংহাসনে বসেও তাঁর মনে শান্তি ছিলনা। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, যেমন করেই হোক তিব্বত থেকে এই অজ্ঞতা, এই অধার্ম্মিকতা দূর করতে হবে।

চার

তিনি স্থির করলেন, পুরনো-দলের লোকদের দিয়ে হবেনা, নতুন মানুষের দল তৈরী করতে হবে। বেছে-বেছে সাতটি বুদ্ধিমান বালক সংগ্রহ করলেন। তাদের পিতামাতার কাছ থেকে যশী হড্ তাদের জীবনের সমস্ত দায়িত্ব এবং ভার গ্রহণ করলেন।

সেই সাতটি ছেলেকে তাঁর নিজের মতন ক'রে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ ক'রে তুললেন। এইভাবে ক্রমে তিনি একুশ জন যুবককে গ'ড়ে তুললেন।

তাদের শিক্ষা শেষ হ'লে, একদিন তাদের সকলকে ডেকে বললেন, এখানকার শিক্ষা তোমাদের শেষ হয়েছে, কিন্তু তোমাদের শিক্ষা এখনও অসম্পূর্ণ। এইবার তোমাদের হিমালয় পার হয়ে কাশ্মীরে, মগধে, তক্ষশীলায় যেতে হবে। সেখানে ভারতবর্ষে মহাজ্ঞানী সব পুরুষ আছেন। সমস্ত ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ ক'রে, সেই-সব পণ্ডিতদের কাছ থেকে জ্ঞান সংগ্রহ ক'রে তোমাদের তিব্বতে ফিরতে হবে। আর-একটি কথা, তোমাদের সঙ্গে আমি প্রচুর স্বর্ণ দেবো; তিব্বতে সত্যকারের জ্ঞানধর্ম্ম প্রচারের জন্য সে স্বর্ণ দিয়ে ভারতবর্ষ থেকে যাকে তোমরা উপযুক্ত মনে করবে, সেইরকম একজন পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠকে তিব্বতে নিয়ে আসতে হবে।

যশী হডের আদেশ নতমস্তকে গ্রহণ ক'রে একুশ জন জ্ঞান-ভিক্ষু জ্ঞান-অমৃতের জন্যে সেদিন দুর্গম হিমালয়ের পায়ে-হাঁটা-পথ দিয়ে ভারতবর্ষের দিকে যাত্রা করেন।

সে কি দুর্গম পথ! স্বর্ণ-খনির লোভেও সে-পথ দিয়ে মানুষ যাতায়াত করতোনা। পদে-পদে সেখানে তুষারের মধ্যে পথ হারিয়ে যায়। পথে-পথে দস্যু,

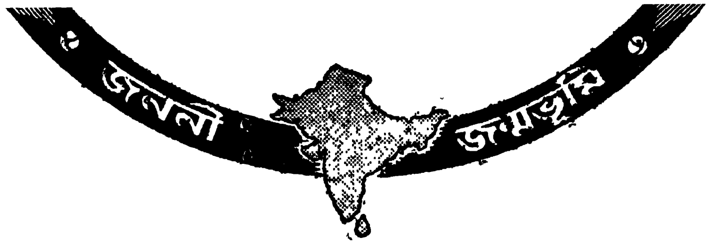
দস্যুর চেয়ে ভয়ঙ্কর সব হিংস্র জন্তু, বিষভরা সব বিষধর। কোথাও দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড় মেঘের ওপরে মাথা তুলে আছে, কোথাও তরণীহীন দুস্তর নদী, কোথাও-বা অন্ধকারে পথহীন অরণ্য—যোজনের পর যোজন বিস্তৃত হয়ে আছে।



তোমাদের হিমালয় পার হয়ে কাশ্মীরে, মগধে, তক্ষশীলায় যেতে হবে

সেই দুর্গম-পথে যাত্রা করলো, একুশ জন জ্ঞান-ভিক্ষু।

উনিশজন সে-পথ দিয়ে আর ফিরে এলোনা। পথ তাদের গ্রাস ক'রে নিলো। মাত্র দু'জন ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ ক'রে তিব্বতে আবার ফিরে আসতে পেরেছিল। সে দু'জনের নাম—রিন্ ছেন্ জন্ পো এবং লেগ্স পহি সেরাব্।



পাঁচ

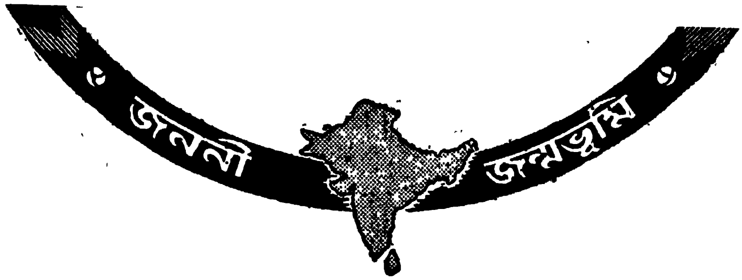
তাঁরা দু'জনে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ ক'রে বুঝতে পারলেন যে, নালন্দার প্রধান অধ্যক্ষ দীপঙ্করের তুল্য-পণ্ডিত ভারতে আর নেই। যেখানেই তাঁরা যান, সেই-খানেই শোনেন, দীপঙ্কর হলেন—সর্বজ্ঞ।

তাঁরা মনে-মনে স্থির করলেন, যেমন করেই হোক্, দীপঙ্করকে তিব্বতে নিয়ে যেতে হবে।

নালন্দা-মহাবিহারে এসে তাঁরা দীপঙ্করের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁর অপূর্ব শ্রী এবং শান্ত বচন শুনে তাঁদের অন্তর বিমুগ্ধ হয়ে গেল। একদিন দীপঙ্করকে নিভৃতে পেয়ে তাঁরা তিব্বতরাজ যশী হুডের অন্তরের বাসনা জানিয়ে তাঁর পায়ের তলায় বিরাট একতাল সোনা উপহার স্বরূপ রাখলেন। বললেন, ভারতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীর জন্যে তিব্বতরাজ এই উপহার পাঠিয়েছেন। আপনি গ্রহণ ক'রে আমাদের সকলকে ধন্য করুন। আপনাকে তিব্বতে নিয়ে যাবার জন্যেই এই নিদারুণ পথের কষ্ট সহ্য ক'রে আমরা এখানে এসেছি। আপনি যদি তিব্বতে আসেন, তাহ'লে আপনার জন্যে রাজার স্বর্ণভাণ্ডার খোলা থাকবে, প্রত্যেক তিব্বত-বাসীর শ্রদ্ধা আপনি নিত্য অর্ঘ্যস্বরূপ পাবেন।

তাঁদের কথা শুনে হেসে দীপঙ্কর বললেন, তিব্বতরাজের স্বর্ণভাণ্ডারের দ্বার চিরকাল তিব্বতবাসীদের জন্যে খোলা থাক্; এক রতি স্বর্ণেও আমার কোনো প্রয়োজন নেই। আর, কোনো লোকের শ্রদ্ধার অর্ঘ্যও আমি কামনা করিনা। এখন আমি নালন্দা ত্যাগ ক'রে যেতে অক্ষম। এখানে আমার ঘাড়ে এখন প্রভূত দায়িত্ব।

তখন তাঁরা কেঁদে ফেললেন। বললেন, আমরা একুশ জন যাত্রা করেছিলাম। মাত্র দু'জন অবশিষ্ট আছি। উনিশ জন এই উদ্দেশ্যে প্রাণ দিয়েছেন। আপনি দয়া করুন!



তাঁদের সেই সকরুণ কাহিনী শুনে দীপঙ্কর আশ্বাস দিলেন। বললেন, ক্ষুব্ধ হয়োনা। সেই উনিশ জনের মৃত্যুকে ব্যর্থ মনে করোনা। তবে এ-কথা নিশ্চিত, এখন আমার তিব্বত যাওয়া সম্ভব নয়। তোমরা এই স্বর্ণ উপহার নিয়ে তিব্বতে ফিরে যাও। তিব্বতরাজকে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা জানিও।

অশ্রুতে দু'চোখ ভ'রে, যে-পথ দিয়ে আসতে উনিশ জন সঙ্গীকে তারা হারিয়েছিল, সেই পথ দিয়ে তারা আবার তিব্বতে ফিরে গেল।

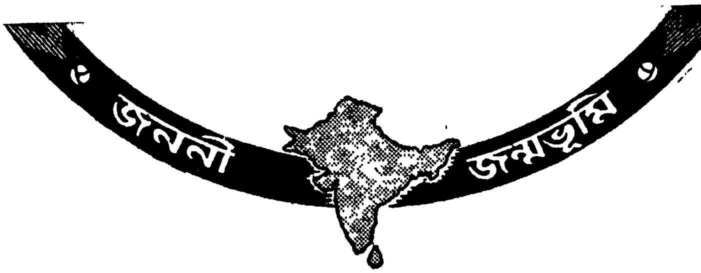
ছয়

তাঁদের মুখে যশী হড্ সমস্ত কথা শুনলেন। দীপঙ্করের জ্ঞান-মহিমার কথা শুনে, মনে-মনে তিনি বার-বার সেই পণ্ডিতের উদ্দেশ্যে নতি জানালেন। কিন্তু যখনই ভাবেন যে, তিনি এলেন না, তখনই তার অন্তর বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। তার সমস্ত অন্তর আকুল ক'রে কান্না জেগে ওঠে, তিব্বতের সমস্ত স্বর্ণ দিয়েও তোমাকে পেলামনা! হে গুরু, আর কি চাও? কবে তুমি আসবে?

যশী হড্ অনেক ভেবে স্থির করলেন যে, দীপঙ্কর যদি না আসেন, তাহ'লে তাঁর পরেই যিনি পণ্ডিত আছেন, আপাতত তাঁকে আনতে হবে। এবং তিব্বত থেকে ছাত্র পাঠিয়ে, তাদের ভারতবর্ষ থেকে সুপণ্ডিত ক'রে আনতে হবে। তারাই পণ্ডিত হয়ে ফিরে এসে তিব্বতে নবযুগের সূচনা করবে।

এই স্থির ক'রে তিনি আবার একদল লোককে ভারতবর্ষে পাঠালেন। ইতিমধ্যে তিনি প্রচুর স্বর্ণ সংগ্রহ করবার পথ খুঁজতে লাগলেন। কারণ, এই ব্যাপারে যে পরিমাণ স্বর্ণের প্রয়োজন, তা তাঁর রাজভাণ্ডারে নেই।

এইসময় তিনি সংবাদ পেলেন যে, নেপালের সীমান্তে একটি স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হয়েছে। অল্পসংখ্যক লোক নিয়ে তিনি সেই স্বর্ণখনি দেখতে যাত্রা করলেন।



যেখানে স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হয়েছিল, তারই নিকটে ছিল, দুর্দ্ধর্ষ গারলঙ্-রাজের রাজত্ব। এই গারলঙ-রা অত্যন্ত হিংস্রপ্রকৃতির লোক ছিল। বৌদ্ধদের তারা ঘৃণা করতো। বিশেষতঃ, যশী হড়ের ওপর গারলঙ্-রাজের ভয়ানক আক্রোশ ছিল।

গারলঙ্-রাজ গুপ্তচরের মুখে সংবাদ পেলো যে, তিব্বতরাজ যশী হড্ অতি অল্প সংখ্যক লোক নিয়ে তারই রাজ্যের সীমান্তে এসেছেন।

কাল বিলম্ব না ক'রে, সৈন্যসামন্ত নিয়ে গিয়ে, একদিন সহসা গারলঙ্-রাজ যশী হড্ এবং তাঁর অনুচরদের আক্রমণ করলো। হঠাৎ এইভাবে আক্রান্ত হওয়ায় যশী হড্‌কে সহজেই পরাভব স্বীকার করতে হলো। গারলঙ্-রাজ যশী হড্‌কে বন্দী ক'রে, ঘোষণা করলো যে, হয় যশী হড্‌কে বৌদ্ধধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে, তাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করতে হবে, নতুবা তাঁর দেহের সমান ওজনের স্বর্ণ দিতে হবে। নতুবা মৃত্যু।

এই সংবাদ তিব্বতরাজ্যে গিয়ে পৌছলে লোকে হাহাকার ক'রে উঠলো। যশী হড়ের দুই ছেলে এবং একজন ভাইপো ছিলেন। তিনজনই যশী হড্‌কে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করতেন। তারা কাল বিলম্ব না ক'রে স্বর্ণ সংগ্রহ করতে লাগলেন।

প্রচুর স্বর্ণ সংগ্রহ ক'রে তাঁর ভাইপো চেন্ চাব্, গারলঙ্-রাজের কাছে উপস্থিত হলেন।

সমস্ত স্বর্ণ ওজন ক'রে দেখা গেল, মাথার ওজনের পরিমাণ সোনা কম পড়ছে।

নিষ্ঠুর গারলঙ্-রাজ বললেন, কম সোনা নিয়ে তিনি যশী হড্‌কে কিছুতেই মুক্তি দেবেননা।

চেন্ চাব্ বহু কাতর মিনতি জানালেন;—কিছু সময় পেলে তিনি আরও স্বর্ণ সংগ্রহ ক'রে দেবেন। কিন্তু গারলঙ্-রাজ আর সময় দিতেও চাইলেননা। হয় যশী হড্‌কে বৌদ্ধধর্ম্ম ত্যাগ করতে হবে, নতুবা কারাগারে মৃত্যুকে বরণ করতে হবে।



চেন্ চাব্ কারাগারে যশীহড়ের সঙ্গে দেখা করলেন। যশীহড়ের মুখে দুঃখের কোনো চিহ্ন নেই।

চেন্ চাব্‌কে তিনি ছেলেদের চেয়েও ভালোবাসতেন। তাঁকে তিনি স্বয়ং সযত্নে বৌদ্ধশাস্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন। চেন্ চাব্‌কে কাঁদতে দেখে, যশী হড্ বললেন, তুমি অকারণে বিষণ্ণ হচ্ছো। তুমি পণ্ডিত। মৃত্যুতে কাতর হওয়া তোমার শোভা পায়না। অকারণে এত স্বর্ণ কেন খরচ করবে? এই স্বর্ণ থাকলে ভারতবর্ষ থেকে বহু পণ্ডিতকে আনা সম্ভব হবে।



কম সোনা নিয়ে যশী হড্‌কে কিছুতে মুক্তিই দেবেননা

আমার জন্য দুঃখিত হয়োনা। এ আমার পরম সৌভাগ্য যে, ধর্ম্মের জন্যে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করতে পারলাম। তবে একটা মিনতি তোমাকে জানিয়ে



যাই, তুমি যেমন ক'রে হোক্ দীপঙ্করের কাছে এই সংবাদ পাঠাবে—তিব্বতের সমস্ত স্বর্ণ দিয়ে নয়, জীবন সমর্পণ ক'রে জ্ঞান-ভিক্ষু যশী হড্ এই অন্তিম-মিনতি তাঁর কাছে জানিয়ে গিয়েছেন, যেন তিনি একবার তিব্বতে আসেন। এই আমার অন্তিম বাসনা!

চেন্ চাব্ বিদায় নিয়ে যশী হডের মুক্তি-মূল্যের জন্য আরও স্বর্ণ সংগ্রহ করতে লাগলেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই শুনলেন যে, কারাগারে তিনি দেহত্যাগ করেছেন।

সাত

যশী হডের অন্তিম বাসনাকে সফল করবার জন্যে চেন্ চাব্ জীবন উৎসর্গ করলেন। আরও দু'বার দীপঙ্করের কাছে লোক পাঠানো হয়েছিল—কিন্তু তিনি প্রত্যেক বারই অক্ষমতা জ্ঞাপন ক'রে সেই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছেন।

চেন্ চাব্ বহু অনুসন্ধান ক'রে বিনয়ধর নামে এক তিব্বতী-পণ্ডিতকে আবার পাঠালেন।

বিনয়ধর ভারতীয়-ভাষাও আয়ত্ত করেছিলেন।

পাঁচজন লোক নিয়ে বিনয়ধর হিমালয় পার হলেন।

আট

নালন্দার দ্বারদেশে আবার তিব্বতের লোক এসে করাঘাত করলো।

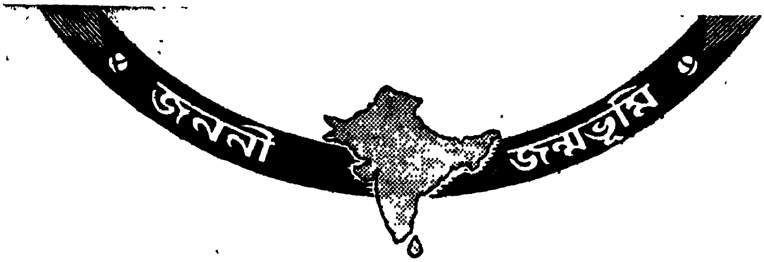
দ্বারী দ্বার খুলে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কোথা থেকে আসছেন?

—আমরা তিব্বত থেকে আসছি!

—কি প্রয়োজন আপনাদের?

—আমরা মহাজ্ঞানী দীপঙ্করকে তিব্বতে নিয়ে যেতে চাই!

বৃদ্ধ দ্বাররক্ষক তাঁদের সাদর সম্ভাষণ ক'রে বিহারের ভিতরে নিয়ে গিয়ে বললেন, তোমরা বড়ই সরল। এইভাবে তোমাদের উদ্দেশ্যের কথা যদি প্রচার



করো, তাহ'লে তোমাদের ওপর এখানকার সকলেই অসন্তুষ্ট হবে। দীপঙ্করকে কেউই ছেড়ে দেবেনা। তাছাড়া তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন। তোমাদের একটা পরামর্শ দিচ্ছি, শোনো। এই বিহারে গ্য-চ্যন্ ব'লে একজন তিব্বতীয় আছেন। তোমরা এখন তাঁর কাছেই থাকো। দীপঙ্কর ছাড়া কারুর কাছে তোমাদের উদ্দেশ্যের কথা জানিয়োনা।

এই ব'লে দ্বারী তাঁদের গ্য-চ্যনের কাছে নিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন। নিজের দেশের লোকদের দেখে গ্য-চ্যন্ও উল্লসিত হয়ে উঠলেন। বিনয়ধর দীপঙ্করের সাক্ষাৎলাভের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

একদিন উষাকালে বিনয়ধর দেখেন, বিহারের বাহিরে বহু ভিক্ষুক অন্নের জন্য সমবেত হয়েছে। একধারে দাঁড়িয়ে তিনি সেই দৃশ্য দেখতে লাগলেন।

কিছুকাল পরে দেখেন, এক দিব্যমূর্ত্তি বৃদ্ধ এসে সেই জনতার সামনে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখবামাত্রই জনতা সমস্বরে চীৎকার ক'রে উঠলো, ভাল হো, নাথ অতীশ, ভাত ওনা, ভাত ওনা! (তোমাদের জয় হোক, প্রভু অতীশ, আমাদের ভাত দাও।)

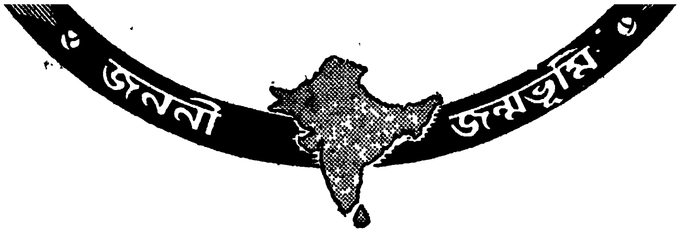
তৎক্ষণাৎ বিনয়ধর বুঝলেন, ইনিই সেই মহাপুরুষ, যাঁর সন্ধানে বারে-বারে তিব্বত থেকে লোক এসে ফিরে গিয়েছে।

বিনয়ধর তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে একধারে দাঁড়িয়ে সেই অন্ন-বিতরণ দৃশ্য দেখতে লাগলেন।

একদিন প্রভু অতীশকে নিভৃতে পেয়ে বিনয়ধর তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে প্রণাম করলেন।

বৃদ্ধ দীপঙ্কর জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে ভিক্ষু?

বিনয়ধর বললেন, আমি ভিক্ষু নই, আমি ভিক্ষুক। আমি এসেছি, তিব্বত থেকে। সমগ্র তিব্বত অন্ন চায়, সে অন্ন থেকে হতভাগ্য তিব্বতবাসীদের বঞ্চিত করা প্রভু অতীশের শোভা পায়না।



বার-বার তিব্বত থেকে লোক এসে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গিয়েছে। সমস্ত কথা দীপঙ্করের মনে পড়লো। তিনি তখন ছিলেন নালন্দা-বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু, আজ যদিও তাঁর কর্ম্মভার লঘু হয়ে গিয়েছে, তবু আজ তিনি বৃদ্ধ, অশীতিপর।



দীপঙ্করের চরণ স্পর্শ ক'রে বিনয়ধর বললেন, আমি এক মৃত-ব্যক্তির অন্তিম-বাসনার বাহক হয়ে আপনার কাছে এসেছি। তিনি হলেন আমাদের রাজা—যশী হড্। শত্রু-কারাগারে মৃত্যুকালে তিনি আপনার কাছেই তাঁর অন্তিম বাসনা জানিয়ে গিয়েছেন।

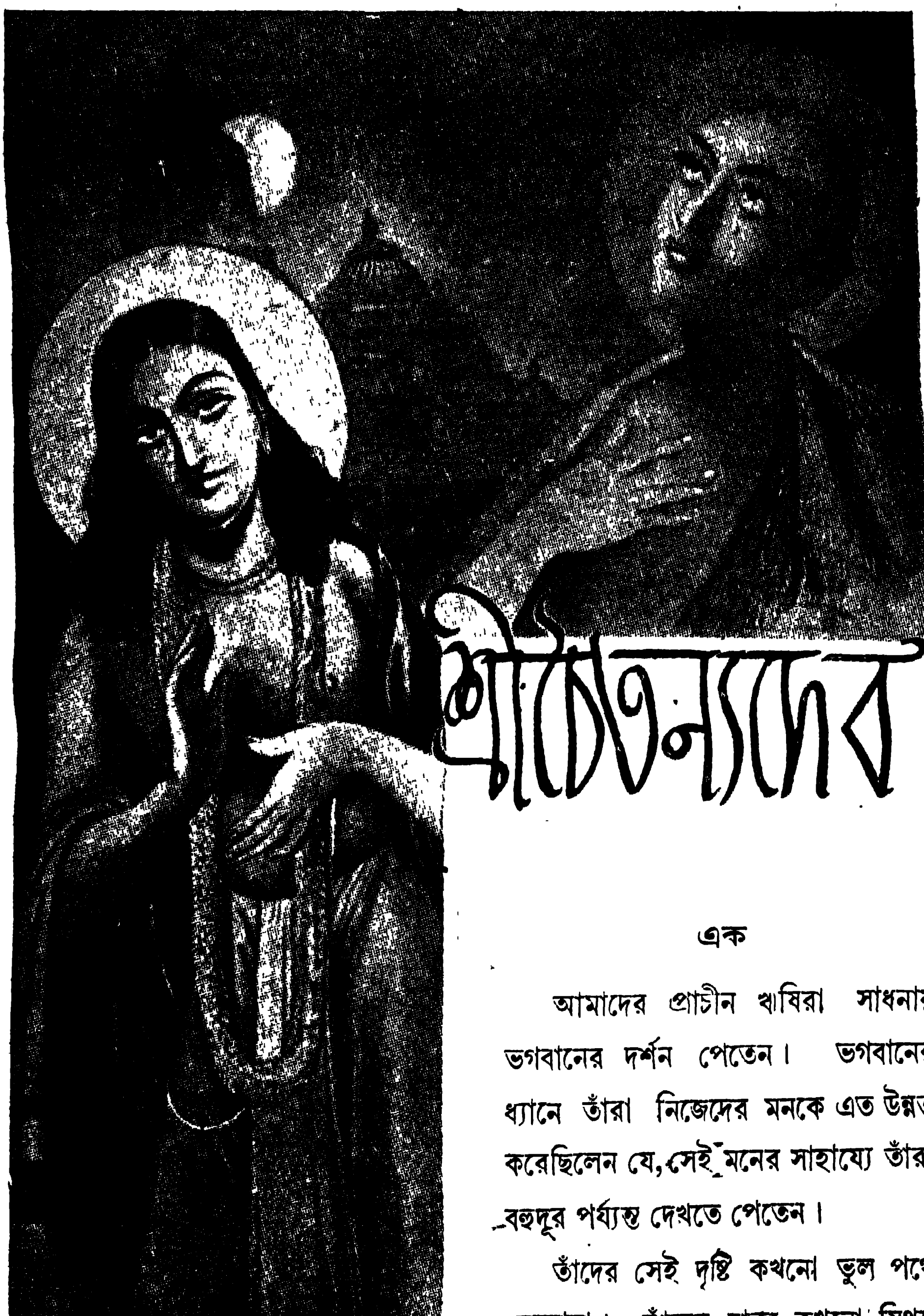
বিনয়ধর তখন যশী হড়ের অপূর্ব মৃত্যুর কথা সমস্ত বললেন। যশী হড়ের সেই অপূর্ব ত্যাগের কথা শুনে বৃদ্ধের অন্তর দুলে উঠলো। মৃত্যু দিয়ে লেখা এ আহ্বান-লিপি কি প্রত্যাখ্যান করা যায়?

বৃদ্ধ দীপঙ্কর বললেন, বেশ, আমি যাবো তিব্বতে। যশী হডের অন্তিম বাসনা আমি সফল করবো। কিন্তু এ-সংবাদ তুমি কাউকেই জানাবেনা। তাহ'লে আমাকে কেউ যেতে দেবেনা। আমরা গোপনে পালিয়ে যাবো।

তারপর একদিন নিশাযোগে গোপনে ভারতের জ্ঞানবৃদ্ধ, তিব্বতের দিকে যাত্রা করলেন।

লোকে বলে, তিনি ছিলেন—জ্ঞানের সূর্য্য। তাঁর অভাবে, হিমালয়ের এপারে ক্রমশঃ অন্ধকার নেমে এলো। তাঁকে পেয়ে হিমালয়ের ওপারে নতুন সূর্য্য জেগে উঠলো! তিব্বত থেকে আর তিনি ভারতবর্ষে ফিরে আসেন নি।

আজপর্য্যন্ত সমগ্র বৌদ্ধজগৎ তাঁর নাম স্মরণে নতমস্তকে বলে, নমো অতীশ, নমো জোভো জী, নমো প্রভু স্বামী!



শ্রীচৈতন্যদেব

এক

আমাদের প্রাচীন ঋষিরা সাধনায় ভগবানের দর্শন পেতেন। ভগবানের ধ্যানে তাঁরা নিজেদের মনকে এত উন্নত করেছিলেন যে, সেই মনের সাহায্যে তাঁরা বহুদূর পর্য্যন্ত দেখতে পেতেন।

তাঁদের সেই দৃষ্টি কখনো ভুল পথে যেতোনা। তাঁদের বাক্য কখনো মিথ্যা হতোনা। তাঁরা সত্য চিন্তা করতেন, সত্য-জীবন যাপন করতেন, সত্য কথা বলতেন।



তাই সেদিন তাঁরা যা ব'লে গিয়েছিলেন, তাঁদের চ'লে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তা মিথ্যা হয়ে যায়নি। তাঁদের কথা—অমর। এই অমর কথা, যা যুগের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হয়না, তাকেই আমরা বলি—মন্ত্র।

আমাদের এমনি একটি অমর মন্ত্র আছে।

আমাদের দেহের মধ্যে যেমন প্রাণ, তেমনি সেই অমর মন্ত্রটি আমাদের ভারতবর্ষের জাতীয়-ইতিহাসের প্রাণ। সেই প্রাণ-মন্ত্রে আমরা বিশ্বাস করি।

সেই মন্ত্রে স্বয়ং ভগবান আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন, যখনি পৃথিবীতে ধর্ম্মের গ্লানি হবে, যখনি অধর্ম্ম শক্তিশালী হয়ে মাথা তুলে উঠবে, মানুষ তার অন্তরের ঐশ্বর্য্যের কথা ভুলে যাবে, তখনি আমি আবির্ভূত হবো।

এই আবির্ভাবের অমৃত-আশ্বাস, আমরা দেখেছি, আমাদের ইতিহাসে বারে-বারে সত্য হয়েছে।

যখনি মানবতা বিপন্ন হয়েছে, তখনি মহা-মানবের দিব্য-রূপে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন। যুগের প্রয়োজনমত তাঁর নব-নব রূপ হয়েছে। সেই নব-নব বিচিত্র রূপের প্রকাশের মধ্যে আমরা স্পষ্ট দেখেছি সেই অপরিবর্ত্তনীয় মহা-একেরই আবির্ভাব।

দুই

তখন সারা ভারতবর্ষে ধর্ম্ম বিপন্ন হয়ে উঠেছে। মন্দিরের চূড়া ভেঙে পড়ছে, বিগ্রহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হচ্ছে, বিদেশী-শাসক সগর্ব্বে ঘোষণা করে…অপরের মন্দির ভেঙে তারা নিজেদের শক্তিরই পরিচয় দিচ্ছে…দেশের মধ্যে এমন কোনো রাজা নেই যে, স্বদেশের ধর্ম্মকে রক্ষা করে। মানুষ হীন, নীচ হয়ে পড়ছে। ধার্ম্মিক দেখলে লোকে পাগল ব'লে ব্যঙ্গ করে। শাস্ত্র ভুলে গিয়ে শুধু তর্ক করে। যে বিদ্বান, সে শুধু তার্কিক। 'তাল—ঢপ্ ক'রে পড়ে, না, প'ড়ে ঢপ্ ক'রে!' নারীরা পুরুষের ভয়ে অন্তঃপুরে পর্দার আড়ালে চলে যায়। মানুষের জঘন্য প্রবৃত্তির প্রতিবাদে একটা নতুন প্রথার সৃষ্টি হয়, বিদেশী-শাসকের ভাষায় তার নাম হয়, পর্দা। শাসকেরা ভয় দেখিয়ে, জোর দেখিয়ে শাসন করে। জোরের সঙ্গে-সঙ্গে বেড়ে ওঠে, অনাচার।



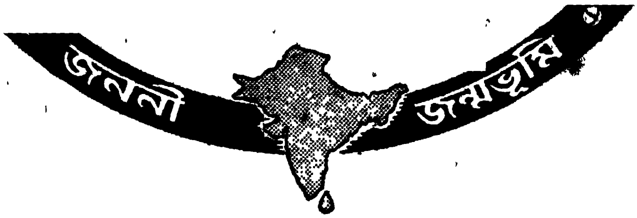
শান্তিপুরে গঙ্গার ধারে সৌম্যমূর্ত্তি এক ব্রাহ্মণ নিজের মনে সেই অমর-মন্ত্রের ধ্যান করেন। তিনি বিশ্বাস করেন ভগবানের সেই আশ্বাসবাণী। তিনি আবার আবির্ভূত হবেন এই অন্যায় রোধ করতে, মানুষকে এই অনাচারের পথ থেকে টেনে আনতে, শুষ্ক তর্কের অসার বিদ্যার মোহ থেকে মানুষকে উদ্ধার করতে।

বিদেশী-শাসক এনেছে নতুন মত, নতুন পথ। তার দরুণ হয়েছে, বিভেদের সৃষ্টি। মানুষ যা করতে যাচ্ছে, তার মধ্যেই বেড়ে উঠছে শুধু বিভেদ। বিভেদের ফলে মানুষের মন থেকে চ'লে যাচ্ছে—বিশ্বাস।



…আর দেরী নাই—শুনতে পেয়েছি তাঁর পদধ্বনি-

গঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে সেই মহাপুরুষ দূর আকাশের দিকে চেয়ে দেখেন। সারা দেশের মধ্যে তখন লোকে যা দেখতে পাচ্ছেনা, তিনি একা তাঁর জ্ঞান-দৃষ্টিতে তাই দেখতে পাচ্ছেন। তিনি তাঁর অন্তরে শুনতে পাচ্ছেন, পদ-ধ্ব নি···ম হা-মা ন ব আসছেন, তাঁর পদধ্বনি তিনি শুনতে পাচ্ছেন, আকাশে, বাতাসে, মহাশূন্য থেকে বায়ুরস্তর ভেদ ক'রে তাঁর অন্তরে।



শুধু গুটিকতক মানুষ, তাঁরা বিশ্বাস করেন, ঋষির মন্ত্রবাক্যে। তাই তাঁরা ভিড় থেকে স'রে নীরবে অপেক্ষা ক'রে থাকেন। অপেক্ষা ক'রে থাকতে-থাকতে, তাঁদের মধ্যে কেউ-কেউ বিচলিত হয়ে ওঠেন। বিচলিত হয়ে উঠেন হরিদাস গোস্বামী। সেই সৌম্যদর্শন মহাপুরুষকে আকুলভাবে জিজ্ঞাসা করেন, আর কত দেরী, হে আচার্য্য!

ঊর্দ্ধে আকাশের দিকে হাত তুলে অদ্বৈত-আচার্য্য বলেন, আর দেরী নেই···আমি শুনতে পেয়েছি তাঁর পদধ্বনি···তিনি আসছেন···এই গঙ্গার তীরেই···

প্রতিদিন প্রভাতে, সন্ধ্যায়, রাত্রি নিশীথে অদ্বৈত-আচার্য্য আহ্বান করেন, এসো, এসো হে প্রভু! শুষ্ক তৃষিত মাটি তোমার বর্ষণ-আশায় কাঙাল হয়ে আছে···এসো, সত্য করো আবার তোমার আশ্বাস-বাণীকে···

শান্তিপুর ত্যাগ ক'রে অদ্বৈত আচার্য্য আসেন নবদ্বীপে।

তিন

ফাল্গুনী-পূর্ণিমা। পুণ্যলোভাতুর নর-নারীরা গঙ্গাস্নান সেরে ইষ্টমন্ত্র জপ করে···

এমন সময় জগন্নাথ মিশ্রের কুটীরে ঘন-ঘন শঙ্খধ্বনি বেজে ওঠে।

সে-শঙ্খধ্বনি অদ্বৈত-আচার্য্যের কানে এসে পৌঁছতে তিনি উল্লাসে নৃত্য ক'রে উঠলেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের অঙ্গনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে তিনি নৃত্য করেন।

তিনি এসেছেন···ঐ শঙ্খধ্বনি শ্রীবাসের অঙ্গনে অদ্বৈত-আচার্য্যের অন্তরে এনে দিয়েছে তার বার্ত্তা।

অদ্বৈতের আনন্দে আনন্দিত হয়ে ওঠেন শ্রীবাস পণ্ডিত। দুই বিদ্বান পুরুষ শিশুর মতন আনন্দে নৃত্য করেন।

ছুটে আসেন, তাঁদের পত্নী···সীতা দেবী আর মালিনী দেবী।

অদ্বৈত তাঁদের ডেকে বলেন, শীগগির যাও তোমরা মিশ্রের বাড়ী···থালাতে সাজিয়ে নিয়ে যাও ধান-দূর্বা, মঙ্গল-উপচার···হুলুধ্বনি ক'রে বরণ ক'রে এসো সেই নবজাতককে!

থালার মঙ্গল-উপচার নিয়ে শঙ্খধ্বনি করতে-করতে এগিয়ে চলেন সীতা দেবী আর মালিনী দেবী···পথে প্রত্যেক কুটীর থেকে বেরিয়ে আসে অন্য-সব পুরনারীরা···সবাই মিলে শঙ্খধ্বনি করতে-করতে অগ্রসর হয় জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ী···

নবজাত শিশুর মুখের দিকে চেয়ে শচীমাতার আনন্দ আর ধরেনা। শচীমাতার মনে হয়, সমগ্র ধরণী যেন শঙ্খরবে তাঁর শিশুকে অভিনন্দন করছে। ফাল্গুনী-পূর্ণিমার চাঁদ আকাশ থেকে নেমে এসেছে তাঁর কোলে।



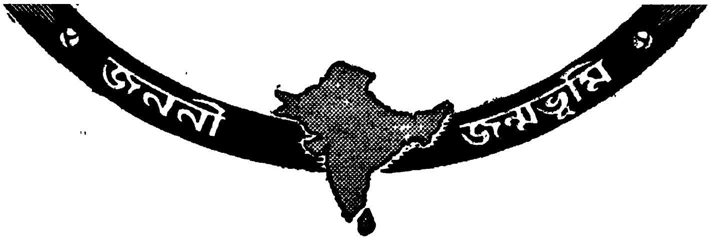
—শিশুর মুখের দিকে চেয়ে শচীমাতার আনন্দ আর ধরেনা—

চার

আদর ক'রে শচীমা নাম রাখেন, নিমাই!

কিন্তু প্রতিবেশিনীর পছন্দ হয়না সে নাম। শিশুর শুভ্র ধবলরূপ দেখে তারা বলে, শচীমা, নিমাই নয়, গৌর, গোরাচাঁদ···

শচীমা মুগ্ধ বিহ্বল-দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন ছেলের দিকে···প্রতিবেশিনীদের কোলে-কোলে বড় হয়ে ওঠে নিমাই।



পাঁচ

বড় হয়ে ওঠে নিমাই,-কিন্তু তেমনি বড় হয় তার দুরন্তপনা।

দুরন্তপনা বাড়ী ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে সারা নবদ্বীপে।

সারা নবদ্বীপে শিশু-দৈত্যের অত্যাচারে রোল ওঠে—নিমাই! নিমাই!

রোল ওঠে গৃহস্থের অঙ্গনে, মাঠে, বাটে, গঙ্গার তীরে।

গঙ্গার তীরে শুচিগ্রস্ত বৃদ্ধা স্নান সেরে পট্টবস্ত্র পরছে···কোথা থেকে নিমাই এমনভাবে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো যে, জল-কাদা ছিটিয়ে গিয়ে পড়লো বৃদ্ধার পট্টবাসে।

স্নান সেরে গঙ্গার ধারে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ চোখ বুঁজে ইষ্টমন্ত্র ধ্যান করছেন, কোথা থেকে নিমাই অতর্কিতে এসে ব্রাহ্মণের পূজার সামগ্রী তুলে নিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কখনো-বা বিগ্রহের মতন ব্রাহ্মণের সামনে এসে বসে। বলে—দাও, কি দেবে পূজো!

ব্রাহ্মণ গর্জ্জন ক'রে ওঠেন, হা-হা শব্দে তিরস্কার করেন, দুরন্ত বালক খিল্-খিল্ ক'রে হেসে বলে, আমার পূজো করো, তবে মুক্তি পাবে।

অতিষ্ঠ হয়ে লোকে শচীমার কাছে নালিশ করে। প্রতিবেশিনীরা আর সহ্য না করতে পেরে বলে, শচীমা, ছেলে শাসন না করতে পারো, আমরা করবো।

শচীমারও সহ্যের বাঁধ ভেঙে যায়। লাঠি নিয়ে দুরন্ত শিশুকে প্রহার করবার জন্যে হাত তোলেন। শিশু হাসতে-হাসতে ছুটে পালায়। শচীমা রাগে লাঠি-হাতে তাড়া ক'রে পিছু-পিছু ছোটেন। নিমাই সামনে দেখতে পায়, এঁটো আর আবর্জনার স্তূপ···গম্ভীর হয়ে তার ওপর গিয়ে বসে। শচীমা আর ছুঁতে পারেননা।

প্রহারের কথা তখন মাথায় উঠে যায়। সেই অশুচি-আবর্জনায় কি মহা অকল্যাণই না হতে পারে···হাত জোড় ক'রে দুরন্ত পুত্রকে অনুরোধ করেন, নেমে আয় আস্তাকুঁড় থেকে!

শিশু গম্ভীর হয়ে বলে, আগে লাঠি ফেলে দাও!

শচীমা পরাজিত হয়ে যান। অশুচি-পুত্রকে গঙ্গাস্নান করিয়ে বাড়ী ফিরিয়ে আনেন।



যে সব প্রতিবেশিনীরা সকালে অনুযোগ করেছিল, সন্ধ্যায় তারা নিমাই-এর জন্যে মিষ্টান্ন নিয়ে আসে। নতুন মিষ্টান্ন, নিমাইকে না দিলে, তাদের মাতৃ-হৃদয় যে তৃপ্ত হয়না!

বহু-বহুযুগ আগে, একদা বৃন্দাবনে এমনিধারা আসতো গোপ-রমণীরা, যশোদা-দুলালের জন্যে উষ্ণ নবনী নিয়ে···তাদের দধিভাণ্ড শিশু ভেঙে দিতো, তারা তিরস্কার করতো···আবার সেই তিরস্কারের জ্বালা সহ্য না করতে পেরে তারাই ছুটে আসতো ক্ষীর সর নবনী নিয়ে।

সে বালক ছিল, কৃষ্ণাঙ্গ! এ বালক—গৌর-বর্ণ।

সেদিন বৃন্দাবন···আজ নবদ্বীপ।

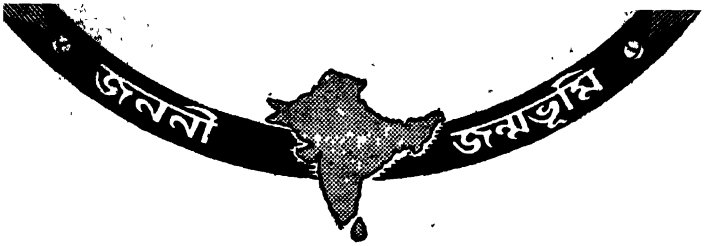


—নিমাই সে-অন্ন নিজের মুখে তুলে উচ্ছিষ্ট ক'রে দিয়েছে—

ছয়

এমনি ক'রে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ক্রমশ নিমাই-এর দৌরাত্মপনা বেড়েই চলে। কিছুতেই তাকে আয়ত্তে আনা যায়না।

একদিন এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ জগন্নাথ মিশ্রের অতিথি হয়ে সেই বাড়ীতেই রইলেন। ব্রাহ্মণ ছিলেন, বালগোপালের ভক্ত। স্বপাকে ভোজন করেন।



কুটীরের এক কোণে শচীমা ব্রাহ্মণের জন্যে চাল, ডাল, তরকারী জোগাড় করে' দেন। ব্রাহ্মণ নিজেই অন্ন তৈরী করেন। কলাপাতায় অন্ন রেখে ব্রাহ্মণ ইষ্টদেব বাল-গোপালকে প্রথমে নিবেদন করবার জন্যে চোখ বুঁজে ধ্যান করতে বসেন। ধ্যান অন্তে চোখ খুলে দেখেন, নিমাই সে-অন্ন নিজের মুখে তুলে উচ্ছিষ্ট ক'রে দিয়েছে এবং সামনে ব'সে হাসছে।

ব্রাহ্মণ বিরক্ত হয়ে অন্ন ত্যাগ ক'রে উঠে পড়েন। শচীমা লজ্জিত বিব্রত হয়ে পুনরায় সব জোগাড় ক'রে দেন। নিমাই পালিয়ে জননীর রোষ থেকে নিজেকে রক্ষা করে।

অন্ন প্রস্তুত ক'রে কলাপাতায় ঢেলে ব্রাহ্মণ যেই আবার চোখ বুজে ইষ্টদেবকে নিবেদন করতে যাবেন, অমনি নিমাই কোথা থেকে এসে আবার সেই অন্ন উচ্ছিষ্ট ক'রে দেয়।

ব্রাহ্মণ চোখ খুলে চেয়ে দেখতেই, বিস্ময়ে পুলকিত হয়ে ওঠেন। তিনি যে কি-দেখলেন, মুখ দিয়ে তাঁর আর কোনো কথা বেরোয় না।

শচীমা থাকতে না পেরে বেত নিয়ে নিমাইকে তাড়া করেন।

ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি উঠে হাত জোড় ক'রে শচীমাকে অনুরোধ করেন, দোহাই আপনার, বেত রেখে দিন! আজ এতদিন পরে আমার সাধনা সফল হয়েছে···আমার ইষ্টদেবকে আজ দেখলাম আপনার বালক-পুত্রের দেহে···গোপাল হাত বাড়িয়ে নিজে আমার অন্নকে প্রসাদ ক'রে দিলো···

ব্রাহ্মণ আনন্দে নৃত্য করতে থাকেন।

শচীমার বুক কিন্তু সে-সংবাদে কেঁপে ওঠে।

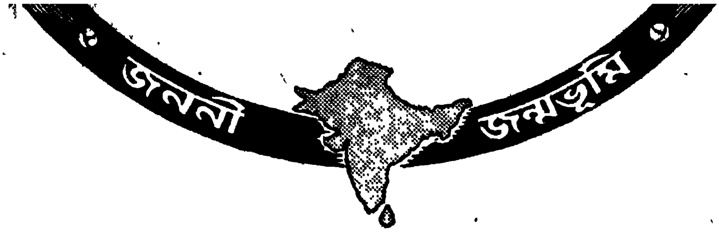
জননীর কাছে পুত্রের সবচেয়ে বড় পরিচয়, সে পুত্র···

মা'র মন চায় সন্তানকে···দেবতাকে নয়।

সাত

ক্রমশ যত দিন যায়, শচীমার বুকে কোথা থেকে তত অজানা ভয় এসে জমা হতে থাকে।

রাত্রিতে আধ-তন্দ্রা আধ-জাগরণের মধ্যে তিনি শুনতে পান, ঘরের চারদিকে কোথায় নূপুর বাজছে···মধুমত্ত ভোমরার দল গুঞ্জন ক'রে ঘুরে ফিরছে···



তন্দ্রা ভেঙে ঘুমন্ত নিমাইকে বুকে টেনে নেন্।

কখনো-বা বাতাসে কোথা থেকে ভেসে আসে স্নিগ্ধ চন্দনের গন্ধ···লক্ষ-লক্ষ পদ্মের সুরভি···

আকুল উতলা হয়ে ওঠে শচীমার মন।

কি এক দৈব-ইঙ্গিত অহরহ তার মাতৃ-হৃদয়কে আতঙ্কিত ক'রে তোলে!

লোকে এসে বলে, শচীমা, দেখো, তোমার নিমাই শাপভ্রষ্ট দেবতা!

শচীমা আরো ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। দেবতা থাকুন দূর স্বর্গে···তার ছেলে থাক্ তাঁর বুকে···কাদায়-ধূলোয়-মাখা মাটির মানুষ।

কিন্তু যত দিন যায়, তত শচীমা নিমাই-এর কাণ্ড-কারখানা দেখে উতলা হয়ে ওঠেন। মাঝে-মাঝে এমন-সব কথা বলে নিমাই, শচীমা শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। এ কোন্ অপদেবতা ভর করলো তাঁর নিমাই-এর কাঁধে!

একদিন দেখেন, নিমাই ভালো-ভালো ব্যঞ্জন ফেলে রেখে মাটির ভাঁড় চিবিয়ে খাচ্ছে। ছেলের সবই অদ্ভুত কাণ্ড!

বিস্মিত হয়ে শচীমা জিজ্ঞাসা করেন, একি কাণ্ড তোর নিমাই? মাটি খাচ্ছিস কেন?

পরম বিজ্ঞের মতন সেই শিশু জননীর কথার উত্তর দেয়, কেন মা? সবই তো মাটির বিকার!

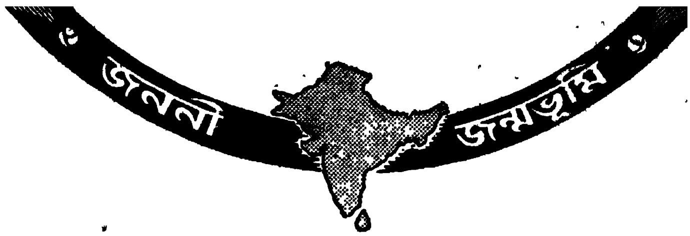
শচীমা বিস্মিত স্তম্ভিত হয়ে যান। এ তো তাঁর শিশু-পুত্রের কথা নয়! এ কোন অপদেবতা তাঁর নিমাই-এর মুখ দিয়ে এ-সব কথা বলছে?

আকুল হয়ে জননী মন্দিরে-মন্দিরে ধরনা দেন···অষ্টপ্রহর বিশ্বজননীর কাছে কাতর প্রার্থনা করেন, ওগো, আমার নিমাইকে সহজ ক'রে দাও···সুস্থ ক'রে দাও!

আট

দুই ভাই, বিশ্বরূপ আর নিমাই!

বিশ্বরূপ বয়সে নিমাই-এর চেয়ে ঢের বড়। নিমাই যখন শিশু, বিশ্বরূপ তখন কিশোর।



বিশ্বরূপ জন্ম থেকে উদাসীন। তাই নিমাই-এর প্রতি শচীমার এত আকর্ষণ।

বিশ্বরূপ স্থির, ধীর···নিমাই চঞ্চল, দুরন্ত। বিশ্বরূপ উদাসীন···নিমাই-এর স্নেহে সারা নবদ্বীপ বাঁধা।

শচীমার বুকের দুইদিক অনবরত কাঁপতে থাকে।

এহেন সময় একদিন দুপুরে বাড়ীর দরজায় এক সন্ন্যাসী এলো। ভিক্ষা চাইলো।

শচীমা তাড়াতাড়ি ভিক্ষা আনতে বাড়ীর ভেতরে এলেন।

ফিরে এসে দেখেন, সন্ন্যাসী নেই। ভিক্ষার ছলে নিষ্ঠুর সন্ন্যাসী তাঁর বুকের একটা দিক চুরি ক'রে নিয়ে গেছে···

বিশ্বরূপ গোপনে সংসার ছেড়ে চ'লে গেছে সেই সন্ন্যাসীর সঙ্গে।

শচীমার বুকের একটা দিকের স্পন্দন থেমে যায়।

সব ছেড়ে তিনি নিমাইকে আঁকড়ে ধরেন। বুকের পাঁজরার সঙ্গে নিমাইকে পারলে গেঁথে রাখেন।

উঠতে, বসতে, খেতে, শুতে, তন্দ্রায় আর স্বপ্নে···শুধু নিমাই আর নিমাই।

নিমাই ছাড়া শচীমার জগতে আর কিছু নেই।

নয়

জগন্নাথ মিশ্র নিমাই-এর হাতে খড়ি দিলেন। নিমাই একবার যা শোনে, একবার যা চোখে দেখে, তাই তার কণ্ঠস্থ হয়ে যায়।

টোলে ছাত্রেরা আবৃত্তি করে, নিমাই-এর কানে সেই আবৃত্তি এসে পৌঁছোতেই তা তার মনে থেকে যায়।

শিশুর মেধা, শিশুর প্রতিভা দেখে পণ্ডিতেরা অবাক।

ক্রমে নিমাইকে টোলে পাঠাবার সময় এলো।

বিশ্বরূপের কথা স্মরণ ক'রে শচীমা বলেন, নিমাই টোলে যাবেনা···তার পড়াশোনা করবার দরকার নেই···

জগন্নাথ মিশ্র বাধা দেননা!

তাঁদের ধাবণা, পড়াশোনা কবলেই আসবে জ্ঞান, জ্ঞান আনবে বৈবাগ্য না···না··· তাব চেয়ে ববঞ্চ মূর্খ হয়ে নিমাই তাঁদেব কাছে-কাছে থাকুক।

নিমাই-এব আব টোলে যাওয়া হয়না! শচীমা কিছুতেই বাজী হননা।

অবশেষে নিমাই নিজের রূপ ধারণ করলো।



দুবন্তপনা শতগুণ বাড়িযে তুললো।

সাবা নবদ্বীপ জগন্নাথ মিশ্রেব সেই দুবন্ত ছেলেব উৎপাতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলো।

শচীমা অনুযোগ শুনতে শুনতে আবাব একদিন ধৈর্য্য হাবালেন। লাঠি হাতে নিমাইকে তাড়া কবলেন।

নিমাই তাব কায়দা-মাফিক এক দুর্গন্ধ নর্দমাব ওপব চেপে বসলো।

লাঠি নামিযে, কি এক অজানা আতঙ্কে শচীমা একেবাবে তটস্থ হয়ে উঠলেন।

নিমাই বলে, আমাকে যদি টোলে পড়তে না দাও, তাহ'লে এই ময়লা সারা গায়ে মাখবো!

অগত্যা শচীমাকে রাজী হতে হয়। গঙ্গাদাসেব চতুষ্পাঠীতে নিমাই ভর্ত্তি হয়।



দশ

জগন্নাথ মিশ্রের মন কিন্তু কিছুতেই সে ব্যবস্থাকে স্বীকার ক'রে নিতে পারলো না। তাঁর সর্ব্বদাই মনে হয়, নিমাই যে-রকম মেধাবী, সে অল্পদিনের মধ্যেই জ্ঞানলাভ ক'রে বিশ্বরূপের অনুসরণ করবে।

এ চিন্তা তাঁকে এমনভাবে পেয়ে বসলো যে, স্বপ্নেও তাঁকে উত্যক্ত করতে লাগলো। একদিন তিনি স্বপ্ন দেখলেন, মুণ্ডিতমস্তক গৈরিকবাসে নিমাই গৃহত্যাগ ক'রে চ'লে যাচ্ছে···

সে-স্বপ্নের কথা তিনি শচীমার কাছ থেকে গোপন রাখলেন, কিন্তু তাঁর নিজের মনের ভিতর অহরহ সেই দুর্ভাবনা তাঁকে পঙ্গু ক'রে ছিল।

তিনি শয্যা নিলেন এবং সে-শয্যা ছেড়ে আর উঠে দাঁড়ালেন না।

নিমাই পিতার শেষ কার্য্য সম্পন্ন ক'রে জননীকে সান্ত্বনা দেয়।

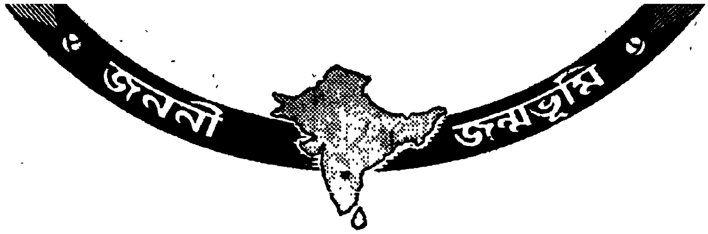
শচীমার জগতে আজ সত্য-সত্যই সেই একটি কিশোর বালক একমাত্র বাসিন্দা··· সে-জগতে আর সত্যই কেউ রইলোনা।

এগারো

গঙ্গাদাস, নবদ্বীপের বিখ্যাত বৈয়াকরণিক ছিলেন। কিশোর নিমাই অতি অল্পকালের মধ্যে সমস্ত ব্যাকরণ কণ্ঠস্থ ক'রে ফেললেন। সারা নবদ্বীপে, পণ্ডিত-মহলেও তাঁর মতন ব্যাকরণ জানা আর কেউ রইলোনা।

শুধু ব্যাকরণ নয়,—ন্যায়, দর্শন, অলংকার—প্রত্যেকটি শাস্ত্রে কিশোর নিমাই অদ্বিতীয় হয়ে উঠলো।

এবং নিজের বিদ্যার গর্বে, অহংকারে, নিমাই সকলকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে লাগলো। সহপাঠীদের ডেকে ব্যঙ্গ করে, উপহাস করে, তাদের বুদ্ধিহীনতায় তাদের ধিক্কার দেয়। পণ্ডিতদের কূট প্রশ্নে বিব্রত ক'রে তোলে। প্রকাশ্যে উপহাস করে। তার বিদ্যার তেজে নিমাই সকলকে জ্বলিয়ে-পুড়িয়ে বেড়ায়।



সেইসঙ্গে তেমনি বেড়ে ওঠে তার দুরন্তপনা। কাউকেই গ্রাহ্য করেনা, কাউকে সমীহ করেনা। কেউ প্রতিবাদ করলে, রেগে মারমুখী হয়ে ওঠে। বাড়ীতে রেগে গেলে জিনিষপত্র হাতের কাছে যা পায়, ভেঙ্গে তচনচ ক'রে ফ্যালে।

স্নেহান্ধ জননী দেখেও দেখেননা। নিমাই আজ বড় হয়েছে। তাকে শাসন করবার চিন্তাও তিনি করতে পারেননা।

বারো

কিশোর কাল উত্তীর্ণ হতে না-হতে নিমাই নিজে পণ্ডিত হয়ে টোল খুলে বসলেন।

তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল! তাই টোল খোলার সঙ্গে-সঙ্গে দলে-দলে ছাত্র আসতে লাগলো। নিমাই-পণ্ডিতের অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখে ছাত্ররা বিমুগ্ধ হয়ে যায়।

নিমাই গর্বে ফুলে-ফেঁপে উঠেন। প্রকাশ্যে অন্য-টোলের পণ্ডিতদের ব্যঙ্গ করেন। বিচারে অনায়াসে সকলকে পরাস্ত ক'রে দেন। ভয়ে কেউ সেই তরুণ পণ্ডিতের সঙ্গে কোনো বিচারে অগ্রসর হতে সাহস করেনা। মদমত্ত হস্তীর মতন তরুণ নিমাই-পণ্ডিত নবদ্বীপের পথে বিচরণ ক'রে বেড়ান। তাঁর উদ্ধত মাথা সকলের উপর উঠে থাকে।

তখন নবদ্বীপে অদ্বৈত-আচার্য্যের প্রেরণায় শ্রীবাস পণ্ডিত গুটিকতক অনুচরদের নিয়ে বৈষ্ণবধর্ম্ম আলোচনা করেন। স্নিগ্ধ শান্তমূর্ত্তি শ্রীবাস পণ্ডিত, পরম বৈষ্ণবের মতন দীনভাবে বৈষ্ণব-জীবন যাপন করেন।

একদিন পথে নিমাই-এর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় শ্রীবাস পণ্ডিতের। বিদ্যার তেজে ডগমগ তরুণ নিমাই, বৈষ্ণব শ্রীবাসকে প্রকাশ্যে ব্যঙ্গ করেন। জ্ঞানের পথ ছেড়ে তাঁরা যে শুধু নাম-কীর্ত্তনের মধ্যে জীবনের পরম পথের সন্ধান করছেন, সে-ব্যাপাব নিয়ে নিমাই তাঁদের উপহাস করেন। বলেন, জ্ঞানহীন যারা, তারা তাঁদের সেই ধর্ম্মের মধ্যে পেয়েছে এক নিরাপদ আশ্রয়। অর্থাৎ, মূর্খ ব'লে তাঁদের উপহাস করেন।

শ্রীবাস নীরবে সে আঘাত সহ্য করেন।



নবদ্বীপ আর শান্তিপুরের বৈষ্ণব-মহলে প্রচারিত হয়ে যায়, তরুণ নিমাই পণ্ডিত দাম্ভিক-শিরোমণি।

অদ্বৈত-আচার্য্য দূর আকাশের দিকে চেয়ে নীরবে শুধু অন্তরে ধ্যান করেন···ধ্যান করেন মহা-মানবের আবাহন-মন্ত্র। তিনি যে অন্তরের মধ্যে শুনেছেন তাঁর পদধ্বনি···সে শোনা কি তবে ব্যর্থ হয়ে যাবে? বৈষ্ণবের মতন তিনি থাকেন, শুধু অপেক্ষা ক'রে···

ভের

ইতিমধ্যে শচীমাতা পুত্রের বিবাহ দিয়ে ঘরে পুত্রবধূকে নিয়ে এলেন। লক্ষ্মীদেবী রূপে আর গুণে লক্ষ্মীই বটে।

তরুণী ভার্য্যার সঙ্গ-সুখে আর অধ্যাপনায় নিমাই-পণ্ডিতের দিন আনন্দে কেটে যায়।

এহেন অবস্থায় একদিন নবদ্বীপের পথে নিমাই-পণ্ডিত দেখেন, অপরূপ সৌম্যমূর্ত্তি এক প্রৌঢ় ব্যক্তি। এমন মধুর রূপ নিমাই আর কখনো দেখেন নি। দাম্ভিক-শিরোমণি নিমাই-এর মনে কি জানি কি হলো, নিজে যেচে সেই সৌম্য-দর্শনের সঙ্গে আলাপ করেন। জানতে পারেন, নাম ঈশ্বরপুরী, বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য।

নিমাই আদরে ঈশ্বরপুরীকে তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেন।

ঈশ্বরপুরী আনন্দে সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন।

আহার-অন্তে নিমাই-পণ্ডিত ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনা করেন। ঈশ্বরপুরী স্নিগ্ধকণ্ঠে জানান, তিনি শাস্ত্রের মধ্যে দিয়ে ভগবানকে খুঁজতে বেরুননি···পরমাত্মীয়ের মতন তিনি তাঁকে ভালোবাসেন। তাঁর নাম আর কীর্ত্তিকাহিনী নিয়ে তিনি একটি কাব্য লিখেছেন—'কৃষ্ণলীলামৃত।'

নিমাই-পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের কথা তিনি শুনেছিলেন। তাই সরল অন্তরে সেই প্রৌঢ়-বৈষ্ণব তরুণ নিমাইকে বলেন, আমার কাব্যের আলংকারিক দোষ-ত্রুটি যদি অনুগ্রহ ক'রে সংশোধন ক'রে দেন।

ঈশ্বরপুরীর মধুর আলাপে দাম্ভিক বিদ্যাভিমানী নিমাই শান্ত হয়ে যান। বলেন, অলংকারশাস্ত্রে বলে, ভক্তিগ্রন্থের দোষ ধরা অন্যায়।



ঈশ্বরপুরী তবুও বিনীতভাবে অনুরোধ করেন, বলেন, ব্যাকরণ-গত দোষ সংশোধন করায় কোন অন্যায় হয়না।

ঈশ্বরপুরী সুমধুরকণ্ঠে কৃষ্ণলীলামৃত প'ড়ে নিমাইকে শোনালেন। নীরবে নিমাই সেই পাঠ শ্রবণ করলেন। কতকগুলি যে ব্যাকরণ-গত দোষ আর ছন্দপতন ছিল, তা উল্লেখ করলেন।

ঈশ্বরপুরী বিনীতভাবে সে ত্রুটিগুলি স্বীকার ক'রে সংশোধন ক'রে নিলেন।

আনন্দে নিমাই-পণ্ডিতের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চ'লে গেলেন।

একদিন যিনি গুরু হয়ে পথের নিশানার নির্দ্দেশ দেবেন, আজ তিনি শিষ্য হয়ে ভাবী শিষ্যের অন্তরে নীরবে সৃষ্টি ক'রে গেলেন এক মহাবিপ্লব।

সে মহাবিপ্লবের কথা তখন নবদ্বীপে কেউ জানলো না।

নিমাই-পণ্ডিতের মনে সমস্ত ব্যাকরণ আর অলংকারের উর্দ্ধে ঝংকৃত হতে লাগলো, ঈশ্বরপুরীর মধুরকণ্ঠের কৃষ্ণ-প্রেমের রাগিণী···

উড়ন্ত বিহঙ্গমের মুখে উড়ে এলো বীজ···নীরবে লোকচক্ষুর অন্তরালে সে-বীজ মাটি থেকে আহার করতে থাকে প্রাণ-রস···বাইরে কোনো সাড়া নেই, কোন শব্দ নেই··· বিস্মিত-জগৎ সেইদিন তার অস্তিত্বের পরিচয় পাবে, যেদিন মাটির অন্ধকার-গর্ভ ভেদ ক'রে পত্রে-কিশলয়ে সে তার সংগোপনতাকে বিদীর্ণ ক'রে বেরুবে···

চৌদ্দ

এমন সময় একদিন নবদ্বীপে এসে উপস্থিত হলেন, কেশব-কাশ্মিরী, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত।

সারা ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ ক'রে তিনি পণ্ডিতদের সাক্ষাৎ-সংগ্রামে পরাস্ত ক'রে দিগ্বিজয়ী খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন।

বাংলাদেশে নবদ্বীপের খ্যাতি শুনে তিনি শিষ্য-সামন্ত সঙ্গে নিয়ে রাজসমারোহে এসে উপস্থিত হয়েছেন। নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজকে আহ্বান করেছেন, তাঁকে শাস্ত্র ও কাব্য আলোচনায় পরাস্ত করতে, অথবা পরাজয় স্বীকার করতে।

সেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের ভারত-জয়ী কাহিনী শুনে কোনো পণ্ডিতই সংগ্রামে রাজী

হলোনা। সকলে নিমাই-পণ্ডিতের শরণাপন্ন হলো। কিন্তু ইদানীং নিমাই-পণ্ডিতের যে কি হয়েছে, তা লোক বুঝতে পারেনা। সেই মদমত্ত হস্তীর মত বিদ্যার দম্ভের আস্ফালন যেন শান্ত হয়ে আসছে···দুপুরের রোদের সে খাঁ-খাঁ তেজ যেন কমে আসছে···

নিমাই রাজী হলোনা।

কেশব-কাশ্মিরী দিগ্বিজয়ের গর্বে বাংলাকে উপহাস করেন। নবদ্বীপের পণ্ডিত-মহল বিষণ্ণ···বাংলা তাহ'লে আজ পরাজয়কে স্বীকার ক'রে নিলো!

তরুণ নিমাই-পণ্ডিত অপরাহ্নে গঙ্গার ধারে ছাত্রদের মুক্ত আকাশের তলায় পড়াচ্ছেন।

এমন সময় সশিষ্য কেশব কাশ্মিরী সেইখান দিয়ে শঙ্খনাদ করতে-করতে ফিরছিলেন।

গঙ্গার ধারে ছাত্রদের সঙ্গে সেই তেজোপুঞ্জ তরুণ-মূর্ত্তি নিমাইকে দেখে কেশব-কাশ্মিরী ডুলি থেকে নামলেন। এবং নিমাই-এর কাছে অগ্রসর হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমিই কি নিমাই-পণ্ডিত?

নিমাই বিনীত ভাবে উত্তর দেন, আদেশ করুন।

কেশব-কাশ্মিরী বলেন, শুনেছি, নবদ্বীপের মধ্যে তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ···

নিমাই আজ কুণ্ঠিত হয়ে বললেন, ভুল কথা শুনেছেন। আমি ব্যাকরণের অধ্যাপনা করি বটে, কিন্তু তার শেষ এখনো দেখিনি।

কেশব-কাশ্মিরী গর্বভরে বলেন, বেশ তো, ব্যাকরণ সম্বন্ধে যদি তোমার কোনো জিজ্ঞাসা থাকে, তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারো।

নিমাই বুঝলেন, পণ্ডিতের দিগ্বিজয়ের অহঙ্কার তাঁকে ক্ষুদ্র না ক'রে বিরত হবেনা। তখন নিমাই স্বমূর্ত্তি ধারণ করলেন। বললেন, শুনেছি, আপনি অসাধারণ কবি।

কেশব-কাশ্মিরী বলেন, তাতে কি তুমি সন্দেহ করো?

নিমাই বলেন, না। আমি শুধু দেখতে চাই, আপনার সেই প্রতিভার বিকাশ। সামনে এই জাহ্নবী প্রবাহিত, আপনি এই নদীর ওপর মুখে-মুখে শ্লোক রচনা ক'রে আমাকে শোনাতে পারেন।

কেশব-কাশ্মিরী তৎক্ষণাৎ একশত শ্লোকে গঙ্গার মহিমা বর্ণনা ক'রে আবৃত্তি করলেন। এবং বর্ণনা শেষে গর্বভরে নিমাই-পণ্ডিতের দিকে চেয়ে বললেন, তুমি সন্তুষ্ট ?

নিমাই বিনীতভাবে বলেন, কিন্তু—আপনার বর্ণিত শ্লোকগুলির মধ্যে তু'একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনতে আমি উদগ্রীব।



—একশত শ্লোকে গঙ্গার মহিমা বর্ণনা ক'রে আবৃত্তি করলেন—

কেশব-কাশ্মিরী বলেন, বেশ তো, কোন্-কোন্ শ্লোকেব ?

নিমাই তখন সেই একশত শ্লোকের ভেতর থেকে তুটি শ্লোক, ঠিক যে ভাষায় কাশ্মিরী বলেছিলেন, সেই ভাবেতেই উদ্ধৃত ক'রে জানান।

সহসা কেশব-কাশ্মিরীর মুখ পাংশু হয়ে এলো। একবার মাত্র কানে শুনে এই একশত শ্লোকের মাঝখান থেকে তুটি শ্লোক একেবারে যথাযথ কিভাবে নিমাই-পণ্ডিত উদ্ধৃত করলেন ? সেই অপরূপ স্মৃতি-শক্তির দিব্য প্রকাশে কেশব-কাশ্মিরীর সমস্ত দম্ভ নিমেষে ধূলায় মিশিয়ে গেল।



তখন নিমাই একে-একে তাঁর কথিত শ্লোকে কোথায় ব্যাকরণ-চ্যুতি হয়েছে, তার আলোচনা করতে লাগলেন।

কেশব-কাশ্মিরী মাথা নত ক'রে সেই তরুণ পণ্ডিতকে প্রণাম করলেন, আজ তুমি আমার দম্ভ চূর্ণ করলে! হে অদ্বিতীয় তরুণ, তোমাকে প্রণাম!

পনেরো

নিমাই পণ্ডিতের খ্যাতির কথা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়লো।

এইসময় নিমাই কিছুদিনের জন্যে পূর্ব্ব-বঙ্গে বেড়াতে বেরুলেন। ফিরে এসে শোনেন, বাড়ীতে কান্নার রোল। লক্ষ্মীদেবী সর্পাঘাতে অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন।

সেই নিদারুণ দুঃসংবাদে তরুণ-হৃদয় আলোড়িত হয়ে উঠলো, কিন্তু নিমাই একান্ত ধীরভাবে সে-বেদনাকে স্বীকার ক'রে নিলেন।

শচীমা শূন্য ঘরকে পূর্ণ করবার জন্যে পুত্রের দ্বিতীয়বার বিবাহ দিলেন। সনাতন পণ্ডিতের কন্যা—বিষ্ণুপ্রিয়া। এমন সুলক্ষণা মেয়ে তিনি আর দেখেননি।

স্বামীর বেদনা-দগ্ধ অন্তরে স্নিগ্ধ অমৃত-প্রলেপ লেপন করেছিল বিষ্ণুপ্রিয়া। বিষ্ণুপ্রিয়ার ভালোবাসায়, সেবায়, আদরে ও যত্নে নিমাই সংসারের সব জ্বালার কথা ভুলে গেলেন।

এমন সময় একদিন পিতৃ-তর্পণের জন্যে নিমাই-পণ্ডিত গয়াতীর্থে যাত্রা করলেন।

ষোলো

যুগ-যুগান্তের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত পিতৃ-পুরুষের তর্পণ-স্তোত্র…

এই পথ দিয়ে যুগ-যুগান্ত ধ'রে লোক এসেছে প্রস্থিত পিতৃ-পুরুষদের আত্মার তৃপ্তির জন্যে…

সেই পুণ্য-ক্ষেত্রের মাটি স্পর্শ করতে নিমাই-এর মনে কি যে হয়ে গেল, নিমাই নিজেই তা বুঝতে পারেন না।

অন্তঃসলিলা ফল্গুর পুণ্য-জলে স্নান সেরে নিমাই মন্দিরে প্রবেশ করেন।



মন্দিরের ভেতরে আছে বিষ্ণুর পাদ-পদ্মের চিহ্ন। একদা উদ্ধত গয়াসুরের মাথার উপরে বিষ্ণু যে রাঙা পায়ের আঘাত করেছিলেন, মন্দিরের পাণ্ডারা বলেন, মন্দিরের ভেতরে শিলাগাত্রে রয়েছে সেই বিষ্ণু-পাদপদ্ম।

শান্ত নিমীলিত নেত্রে নিমাই সেই পাদপদ্মের দিকে চেয়ে থাকেন।

মন্দিরের পুরোহিত তখন বিষ্ণুর মহিমা গেয়ে ওঠেন।

নিমাই একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে-থাকতে ক্রমশ পাথরের মতন স্থির হয়ে যান। সেই বিষ্ণু-পাদপদ্মের মধ্যে কোন্ জন্ম-জন্মান্তরের সূত্রে তাঁর মনে কোন্ রহস্যলোক থেকে আসে কি বার্ত্তা, সব চেতনা তাঁর বিলুপ্ত হয়ে যায়, নিস্পন্দ স্থির দেহ, শুধু দুই চোখ দিয়ে দরধারায় গড়িয়ে পড়ে অশ্রু। ক্রমশ তাঁর চেতনা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে আসে, আর স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে মূর্চ্ছিত হয়ে ঢলে পড়েন···

ঠিক সেইমুহূর্ত্তে এক সৌম্যদর্শন সন্ন্যাসী নিমাই-এর পতনোন্মুখ দেহকে নিজের বক্ষে ধারণ ক'রে নিলেন।

জ্ঞান ফিরে এলে নিমাই দেখেন, তিনি ঈশ্বরপুরীর কোলেতে শুয়ে আছেন।

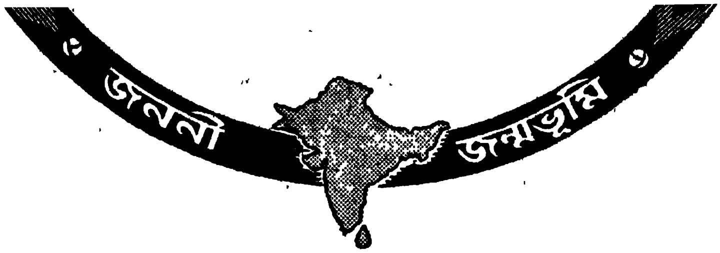
সতেরো

আমাদের দৃষ্টির বাইরে আর-এক জগৎ আছে, সেখানকার সংবাদ আমরা সাধারণ লোকে জানিনা।

এখানকার মতনই সেখানে ওঠে ঝড়, হয় বর্ষণ, চমকায় বিদ্যুৎ। অতর্কিতে কখন আমাদের ছুঁয়ে যায়, কখনো জানতে পারি, কখনো জানতে পারিনা।

যাঁরা বৈজ্ঞানিক, তাঁরা যেমন অনুবীক্ষণের সাহায্যে দৃষ্টির অতীত জীবাণুদের দেখতে পান, তেমনি যাঁরা মনের বিজ্ঞান জানেন, তাঁরা তাঁদের সাধারণ দৃষ্টি দিয়ে তেমনি সেই অদৃশ্য-মনোজগতের সকল ব্যাপার দেখতে পান। আমরা তাঁদেরই বলি ঋষি, তাঁদেরই বলি মহামানব।

এই মানুষের মনের সঙ্গে, সেই অদৃশ্য বিরাট জগতের অন্তরের সঙ্গে, মানুষ যোগসাধন করতে পারে। যখন সেই যোগসাধন হয়ে যায়, তখন নিমেষে যুগান্তর ঘটে যায়,



এক লহমার মধ্যে শত-শত যুগের সঞ্চিত পুণ্যফল মূর্ত্তি ধ'রে জাগে। প্রকৃতি তার স্বাভাবিক নিয়মে যে বিবর্তন ঘটাতে হয়তো সহস্র বর্ষ নিতো, সেই রহস্যলোকের স্পর্শে এক নিমেষে সে বিবর্তন ঘটে যায়।

এক নিমেষে ঘটে গেল নিমাই-এর অন্তরে মহাযুগান্তর। সেই উদ্ধত নিমাই, সেই বিদ্যাভিমানী নিমাই, সেই চিরচঞ্চল নিমাই কোথায় যেন নিমেষে অন্তর্হিত হয়ে গেল···

ঈশ্বরপুরীর কোলে শুয়ে আছে যে নিমাই, সে সম্পূর্ণ আলাদা আর-এক নিমাই।

চেতনা ফিরে পেয়ে নিমাই উঠে বসেন। দুই হাত জোড় ক'রে নতজানু হয়ে ঈশ্বরপুরী বলেন, হে গুরু, আমাকে দীক্ষা দাও, আমাকে পথের মন্ত্র ব'লে দাও!

ঈশ্বরপুরী হাত ধ'রে তরুণ নিমাইকে তুলে ধরেন, বলেন, তুমি যদি চাও, এ-জীবন দিতে পারি তোমার হাতে তুলে। তোমারি জন্যে আমি আছি অপেক্ষা ক'রে।

শিষ্য যাঁকে গুরু ব'লে দেখলেন, সেই গুরু—শিষ্যের মধ্যে দেখলেন তাঁর পরম ইষ্টকে।

অশ্রু-ছলছল চোখে ঈশ্বরপুরী বলেন, আমার পরম সৌভাগ্য, আজ আমি হবো তোমার দীক্ষা-গুরু!

কাতর নিমাই বলেন, মন্ত্র দাও···মন্ত্র দাও!

তখন ঈশ্বরপুরী নিমাই-এর শ্রবণে তাঁর ইষ্টমন্ত্র দান করলেন, কৃষ্ণ-নাম···

সে-নাম শ্রবণে বিকশিত কদম্বের মতন নিমাই-এর সর্ব-অঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো··· শিশুর মতন দু'হাত তুলে নৃত্য করেন আর কাঁদেন, হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ!

নদীর তীরে-তীরে, ঘন অরণ্যে উন্মাদের মতন ঘুরে বেড়ান, কখনও নদীর তীরে পাথরের মূর্ত্তির মতন ধ্যানে কৃষ্ণময় হয়ে যান।

সামনে যা দেখেন, তাই মনে হয় যেন কৃষ্ণময়। বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, পথ, পথের ধূলা, সবই কৃষ্ণ-চন্দনের সুরভিতে মাখা। অসীম প্রেমে মনে হয়, যেন সারা বিশ্বকে দু'হাতের আলিঙ্গনের মধ্যে বেঁধে ফ্যালেন। আকাশ পৃথিবী সে-প্রেমের বিচিত্র রঙে রঙীন হয়ে ওঠে।



আঠারো

নিমাই ফিরে এলেন নবদ্বীপে।

সকলে অবাক হয়ে দেখলো, এ আর-এক নিমাই!

নিমাই ভূমিতে সারা অঙ্গ লুটিয়ে শচীমাকে প্রণাম করেন···মনে-মনে বলেন, কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো···

শচীমার আনন্দ আজ আর ধরেনা।

দুই বাহু বেষ্টন ক'রে বিষ্ণুপ্রিয়াকে আলিঙ্গন করেন, আলিঙ্গন করেন নবনীতকোমল সেই শ্যাম মনোহরকে···

আনন্দে বিষ্ণুপ্রিয়ার দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

দাম্ভিক-শিরোমণি নিমাই আজ চলেছে নিজে যেচে শ্রীবাসের অঙ্গনে।

বৈষ্ণবরা বিস্মিত হয়ে যান। নিমাইকে ঘিরে তাঁরা শুনতে বসেন গয়া-প্রবাসের কথা।

বলতে-বলতে বিষ্ণু-পাদপদ্মের কথায় নিমাই আর কথা বলতে পারে না···অশ্রুবাষ্পে রুদ্ধ হয়ে আসে কণ্ঠ···চেতনা যায় হারিয়ে।

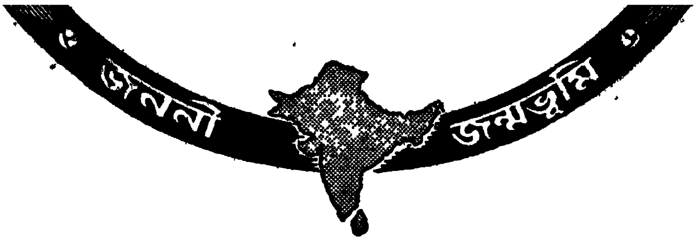
জ্ঞান ফিরে এলে সবাই কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, কি ব্যাপার নিমাই? কি হলো তোমার?

নিমাই বলে, আজ নয়, কাল বলবো···কাল সন্ধ্যায় শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর কুটীরে তোমাদের নির্জনে জানাবো আমার মনের কথা···

বিস্মিত মনে বৈষ্ণবেরা সে-রাত্রির মতন যে-যার কুটীরে ফিরে যান।

উনিশ

পরের দিন সন্ধ্যায় শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর কুটীরে একে-একে বৈষ্ণবেরা সমবেত হন। সকলেই নিমাই-এর অপেক্ষায় আছেন। এমন সময় তাঁরা শুনতে পেলেন, প্রকাশ্য পথ দিয়ে নিমাই-পণ্ডিত ভাগবৎ-শ্লোক আবৃত্তি করতে-করতে আসছেন।



দুই চোখ দিয়ে তাঁর অশ্রু-ধারা গড়িয়ে পড়েছে···সে-অশ্রুতে ভিজে আর্দ্র হয়ে উঠেছে ভাগবতের শ্লোকের ছন্দ···

সকলে উৎকণ্ঠিত হয়ে আছেন নিমাই-এর মুখ থেকে প্রবাস-কাহিনী শোনবার জন্যে, কিন্তু কোথায় নিমাই ? নিমাই শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর অঙ্গনে প্রবেশ ক'রে, হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ ব'লে ধূলায় লুটিয়ে কাঁদেন। সে-কান্নার মধ্যে কি-এক বিদ্যুৎ-প্রেরণা সমবেত সকলের অন্তর স্পর্শ করে···সহসা সকলে যেন একমন হয়ে গিয়ে কৃষ্ণ-নাম উচ্চারণ করতে থাকেন। নাম কীর্ত্তন করতে-করতে সকলে স্পষ্ট অনুভব করেন, ভেতরের সমস্ত চেতনা যেন সেই কৃষ্ণ-নাম স্পর্শে সচকিত হয়ে উঠেছে। নিমাই-এর বাহ্য-জ্ঞান ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে আসে···অবসন্ন, থির দেহ···শুধু নিঃশব্দ ধারায় তখনও দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে···

সকলে অবাক হয়ে যায়। নবদ্বীপের উদীয়মান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, মহাবিদ্যাভিমানী নিমাই-এর একি হলো ভাবান্তর ? নিমাই-এর স্পর্শে তাদের ভেতরেও কি যেন এক নব-অনুরাগের তরঙ্গ উথলে উঠতে থাকে···কদমফুলের মতন দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে···মনে হয়, যেন পৃথিবীতে হিংসা-দ্বেষ, ভালো-মন্দ, ছোট-বড়, আমার-তোমার কিছুই নেই···যা-কিছু চোখে পড়ে, যা-কিছু সামনে আসে, তাকেই যেন আলিঙ্গন ক'রে বুকে জড়িয়ে ধরতে সাধ যায়···কোথা থেকে কেমন ভাবে আসে এই আনন্দের ধারা ? কি যাদু নিয়ে এলো নিমাই ?

নিমাই-এর জ্ঞান ফিরে এলে, সকলে নিমাইকে ঘিরে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেন। নিমাই অশ্রু-সিক্ত কণ্ঠে গয়ার মন্দিরে বিষ্ণু-পাদ দর্শনের কথা বলেন···বলেন কি জানি, সেই বিষ্ণু-পাদ-চিহ্ন দেখতে-দেখতে আমার মনে যেন যুগ-যুগান্তর পার হয়ে গেল··· নিজেকে হারিয়ে ফেললাম···

তারপর আর নিমাই-এর মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোয় না। শুধু হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ ব'লে কেঁদে সারা হন।

সমাগত ভক্তদের মনে সহসা একটা কথা জেগে ওঠে, তবে কি তুমি সেই, যার

জন্যে আমরা অপেক্ষা ক'রে আছি? তুমিই কি বৃন্দাবনের রাখাল-রাজ, শ্যাম-অঙ্গ ফেলে গৌর-তনুতে এসেছো আবার পৃথিবীতে ভালোবাসা আর ভক্তির কথা প্রচার করতে?

বিস্ময়ে, আনন্দে তারা নিমাই-এর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন।

কুড়ি

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর অঙ্গন থেকে বেরিয়ে নিমাই তাঁর গুরু আচার্য্য গঙ্গাদাসের সঙ্গে দেখা করতে যান।

নিমাইকে প্রত্যাগত দেখে গঙ্গাদাস আদরে বুকে জড়িয়ে ধরেন, বলেন, নিমাই, তুমি চলে গেলে পর তোমার শিষ্যরা সকলে পাঠ বন্ধ ক'রে তোমার অপেক্ষায় আছে···তুমি ছাড়া, তারা আর কারুর কাছ থেকে পাঠ নেবেনা!

নিমাই শান্তকণ্ঠে বলেন, কিন্তু গুরুদেব, আমি তো আর তাদের পড়াতে পারবো না!

গঙ্গাদাস বিস্মিত হয়ে বলেন, সে কি কথা নিমাই! তুমি নবদ্বীপের গর্ব, তোমার বিদ্যা, তোমার পাণ্ডিত্য বাংলার সম্পদ। সে সম্পদ তোমাকে তরুণদের বিতরণ করতেই হবে। নইলে তারা বিদ্যালাভ করবে কোথা থেকে? আচার্য্য গঙ্গাদাসের প্রেরণায় নিমাই পরের দিন যথারীতি তাঁর টোলে অধ্যাপনার জন্যে এলেন। এতদিন পরে প্রিয় আচার্য্যকে ফিরে পেয়ে ছাত্রদের আনন্দ আর ধরেনা।

কিন্তু নিমাই ব্যাকরণ পড়াতে গিয়ে পড়াতে পারেন না।

একজন ছাত্র ব্যাকরণের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, সিদ্ধবর্ণের সমন্বয় কি-ক'রে হয়?

কিন্তু নিমাই-এর মন তখন কৃষ্ণ-চিন্তায় ভরপুর। কৃষ্ণ-ছাড়া, কৃষ্ণ-কথা ছাড়া তাঁর চিন্তার আর কিছু নেই। ছাত্রের প্রশ্ন শুনে নিমাই উত্তর দেন, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ যদি দয়া করেন তবেই সিদ্ধবর্ণ হয়, তাঁর দয়া, তাঁর ভালোবাসা ছাড়া জগতে সবই গরমিল···তাঁর ভালোবাসাতেই নিখিলের সমন্বয়!

ছাত্ররা বুঝতে পারেনা। এ তো, ব্যাকরণের প্রশ্নের উত্তর নয়! তারা পরস্পর পরস্পরের মুখ চাওয়া-চায়ি করে। নিমাই-পণ্ডিত তাদের সকলকে ডেকে বলেন, কৃষ্ণ-নাম উচ্চারণ করো, কৃষ্ণ-ধাতু স্মরণ করো, কৃষ্ণ-বাচ্য ছাড়া জগতে আর কোন বাক্য নাই!

বলতে-বলতে নিমাই-এর ছুই চোখ যেন বাষ্পময় হয়ে ওঠে। যেন দূর থেকে বংশীধ্বনি শুনতে পেয়ে উতলা হয়ে টোল থেকে বেরিয়ে পড়েন। মুখে শুধু হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ ধ্বনি।

পরের দিনও টোলে সেই একই ব্যাপার। শিষ্য রত্নগর্ভ বিশেষ শব্দের ধাতুরূপ জিজ্ঞাসা করে, নিমাই উত্তর দেন, কৃষ্ণই একমাত্র ধাতু, একমাত্র নাম··· জগতে যা-কিছু আছে, তৃণ থেকে চন্দ্র সূর্য্য পর্য্যন্ত সবই সেই কৃষ্ণ-ধাতুর রেণু বহন ক'রে চলেছে।



—নিমাই উত্তর দেন, কৃষ্ণই একমাত্র ধাতু—

ছাত্ররা বুঝতে পারে, তাদের আচার্য্যের নিশ্চয়ই মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। তারা মর্ম্মান্তিক ছুঃখে নীরবে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

তাদের সেই অবস্থায় দেখে নিমাই বলেন, ভাইরা, তোমাদের আর আমি কষ্ট দেবোনা! মিছে এই অসার পুঁথির বিদ্যার বোঝা বয়ে আর বেড়াবোনা। আজ আমি তোমাদের আমার প্রাণের কথা বলবো। রাতদিন আমার মনে শুনেছি কে-এক



কৃষ্ণবর্ণ শিশু বাঁশী বাজাচ্ছে, তাঁর বাঁশীর রব নিদ্রায়, জাগরণে, স্বপ্নে আমি স্পষ্ট শুনছি। সেই শ্যামবর্ণ শিশু আমাকে ডাকছে···তার কাছে আমাকে যেতে হবে···তার গোচারণে সাথী-হারা সে একা দাঁড়িয়ে আছে আমারই জন্যে।

এই ব'লে নিমাই-পণ্ডিত, নবদ্বীপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যাকরণিক, বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা, নিজের পুঁথি ডোর দিয়ে বাঁধলেন। বললেন, ভাই, যা-কিছু পুঁথির, তা এই পুঁথিতে বাঁধা রইলো। এই ডোর খুলে আর পুঁথি আমি পড়বো না। বড় অভিমান ছিল আমার বিদ্যার। এই বিদ্যার অভিমান ত্যাগ করতে না পারলে, পাবোনা আমার শ্যামসুন্দরকে।

এই ব'লে সেদিন পুঁথিতে ডোর বেঁধে নিমাই-পণ্ডিত টোল ত্যাগ ক'রে বাড়ী ফিরলেন। আর জীবনে পুঁথিতে তিনি হাত দেননি।

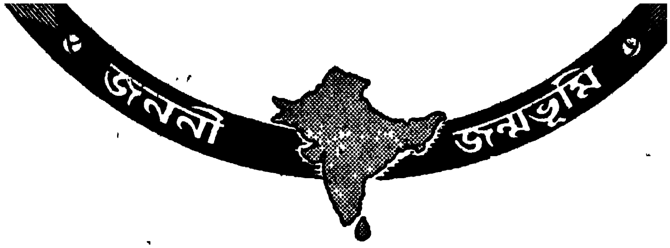
নবদ্বীপের সবচেয়ে বিখ্যাত টোলের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

ভক্তির তরঙ্গে নিমাই নিজেকে ভাসিয়ে দিলেন। শয়নে, স্বপনে, ধ্যানে, জাগরণে কৃষ্ণনাম স্মরণ করেন, প্রতিটি মুহূর্ত্ত অনুভব করেন যেন তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে রয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ। সারাক্ষণ বিভোর তন্ময়। কখনও নৃত্য ক'রে ওঠেন, কখনো ধূলোয় লুটিয়ে গড়াগড়ি দেন, সারারাত জেগে শ্রীবাসের অঙ্গনে হরিনাম করেন।

তাঁর হাব-ভাব দেখে লোকে মনে করলো, নিমাই-পণ্ডিত পাগল হয়ে গিয়েছে। ঘরে-ঘরে সকলে সেই কথাই বলাবলি করে। শচীমা কেঁদে আকুল।

শ্রীবাসের বাড়ীতে সকালবেলা একদিন নিমাই কীর্ত্তনে মেতে উঠেছেন। তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে বহু বৈষ্ণব আজ শ্রীবাসের অঙ্গনে সমবেত হয়েছেন। নিমাইকে ঘিরে আত্মহারা হয়ে সবাই কীর্ত্তনে মেতে উঠেছেন।

এমন সময় নিমাই ঘরের অঙ্গনের সামনে যে বিষ্ণু-মন্দির ছিল, তার ভেতর প্রবেশ ক'রে যেখানে বিষ্ণুর বিগ্রহ ছিল সেখানে গিয়ে বসলেন। চোখে-মুখে তাঁর দিব্য-ভাব। সারা দেহ দিয়ে যেন আলো ঠিকরে পড়ছে। যে-দেবতার কথা রাতদিন তিনি ধ্যান করতেন, ক্রমশ সেই দেবতার সঙ্গে তিনি এক হয়ে গিয়েছিলেন।



ভক্তদের ডেকে তিনি আদেশ করলেন, আমার অভিষেক করো!

তৎক্ষণাৎ ভক্তরা সকলে মিলে যেমন বিষ্ণুর বিগ্রহকে অভিষেক করে, তেমনিধারা নিমাইকে অভিষেক করলেন। কর্পূরে সুবাসিত স্নিগ্ধ পবিত্র গঙ্গাজল কলস·ক'রে তাঁর মাথায় ঢালা হলো, চন্দনে কুঙ্কুমে সুবাসে পুষ্পেমাল্যে তাঁকে সুশোভিত করা হলো, তারপর সকলে মিলে বিষ্ণুর সাক্ষাৎ অবতাররূপে নিমাইকে স্তব করলেন।

স্তব শেষ হওয়ার পর নিমাই আসন থেকে উঠে একে-একে সবাইকে আলিঙ্গন করলেন। সে-আলিঙ্গনে প্রত্যেকের দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো, যেন এক নিমেষে তাদের ভেতর থেকে ধূলোময়লা, দুঃখকষ্টভাবনা কে মুছে দিয়ে গেল। নিমাই একে-একে প্রত্যেকের অতীত-জীবনের কথা প্রত্যেকের দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন। তাঁর দৃষ্টির সামনে তখন ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, সমস্তই স্বচ্ছ হয়ে গিয়েছে। মানুষের মধ্যে আজ জেগে উঠেছেন ভগবান। একেই বৈষ্ণবেরা বলেন, মহাভাব।

সেই মহাভাবে নিমাই সমাগত যে-সব সম্ভ্রান্ত আর ভদ্র-ভক্তরা সেখানে ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকের কাছেই তাঁর দিব্য-অন্তরের প্রকাশ দেখালেন, কিন্তু তাঁর সে মহাভাব শুধু আপন আত্মীয়, বা, বন্ধু-বান্ধবদের জন্যে নয়, সব মানুষেরই জন্যে, হোকনা সে-মানুষ যতই নীচ, যতই হেয়, বা, যতই তুচ্ছ। অন্তর-রাজ্যে সব মানুষই সমান, সেখানে নেই কোনো উঁচু-নীচু ভেদ। সেইকথা বোঝাবার জন্যে নিমাই সেই মহাভাবের মধ্যে সহসা চীৎকার ক'রে ডেকে উঠলেন, শ্রীধরকে। শ্রীধর ছিল বাজারের একজন সামান্য চাষী, হাটে ব'সে তরি-তরকারি বিক্রি করতো। তারই কথা সেদিন বিশেষ ক'রে নিমাই-এর মনে পড়লো।

তৎক্ষণাৎ বাজার থেকে শ্রীধরকে ডেকে আনা হলো। নিমাই শ্রীধরকে তাঁর বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

শ্রীধর কাঁপতে-কাঁপতে বলে, প্রভু, এ কি করলে তুমি? আমি সামান্য চাষী··· তোমার কুকুরের যোগ্য নই।

নিমাই তাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে বলেন, ওরে, তুই-ই আমার ঠাকুর।

শ্রীধর নিমাই-এর পায়ে লুটিয়ে পড়ে।

নিমাই বলে, তুমি আমাব কাছে কিছু বব প্রার্থনা কবো·· যা তোমাব অভিরুচি !

শ্রীধব বলে, প্রভু, এতই যদি তোমাব করুণা, তবে এই বব দাও, বাজাবে যিনি আমাব কাছ থেকে কলা-পাত কিনতেন, তিনিই যেন জন্ম-জন্মান্তবে আমার প্রভু হন্ !

শ্রীবাসেব অঙ্গনে যে-আনন্দেব ঢেউ জাগে, নিমাই চাইলেন, সাবা নবদ্বীপ জেগে উঠুক সে-আনন্দেব ঢেউতে।

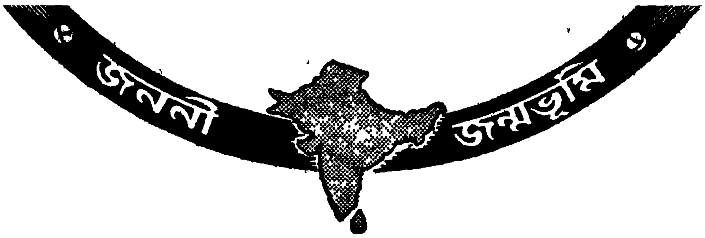
তাই তিনি তাঁব প্রিয় অনুচব নিত্যানন্দ আব হবিদাসকে বললেন, তোমবা প্রতিদিন নবদ্বীপেব ঘবে-ঘবে গিয়ে নাম বিলিযে এসো, লোকে কি বলে সন্ধ্যাবেলা এসে আমাকে জানাবে।

নিত্যানন্দ আব হবিদাস পথ থেকে পথে, নবদ্বীপেব দ্বাব থেকে দ্বারে নাম গেয়ে বেড়ান। কেউ উপহাস কবে, কেউ গালাগাল দেয়। কেউ-বা মুখের ওপর দরজা বন্ধ ক'রে দেয়। বলে, ভক্তি নয়, ভণ্ডামি।



—নিমাই তাকে বুকে জড়িযে ধরে বলেন, ওরে, তুই-ই আমার ঠাকুর—

নবদ্বীপে ছিল দুজন পাষণ্ড মাতাল, জগাই আর মাধাই। সারাদিন মদ খেয়ে



তারা চুর হয়ে থাকতো। হেন অকাজ নেই যা তারা পারতো না। নবদ্বীপের লোকেরা নিত্যানন্দের পেছনে লেলিয়ে দিলো সেই জগাই আর মাধাইকে।

একদিন মাতাল অবস্থায় জগাই আর মাধাই নাম-গানে-মত্ত নিত্যানন্দকে পথে ধরলো।

তু'জনে তু'হাত ধ'রে বলে, বোষ্টম-ঠাকুর, আজ তোমাকে আমাদের সঙ্গে নেশা করতে হবে!

নিত্যানন্দ হেসে বলেন, ওরে, আমি যে চব্বিশ ঘণ্টা নেশায় ভোর হয়েই আছি!

কিন্তু সে-কথায় কান দেবার মতন মন তখন তাদের কোথায়? তারা নানাভাবে নিত্যানন্দকে উত্যক্ত করে···নিত্যানন্দ হেসে সব সহ্য করেন। অবশেষে জগাই আর মাধাই স্বমূর্ত্তি ধ'রে নিত্যানন্দের মাথায় তাড়ির কলসী ঠুকে ভাঙলো। দরধারায় কপাল ফেটে রক্ত ঝরতে লাগলো। রক্ত দেখে জগাই মাধাই পালাবার চেষ্টা করে। তখন নিত্যানন্দ তাদের পথ আগলে বলে, ওরে, কলসী দিয়ে মেরেছিস্ তাতে হয়েছে কি, একবার শুধু শ্রীহরির নাম কর।

জগাই আর মাধাই জীবনে কখনো এ-দৃশ্য দেখেনি। মার খেয়ে যে-লোক মারের কথা মুখেই আনেনা, সে কি-রকম লোক?

সেই একটি ঘটনা, জগাই আর মাধাই-এর মনে সহসা কিসের যেন তরঙ্গ জাগিয়ে তুললো। এতদিন জীবনের যে বাঁধা-পথে তারা চলছিল, হঠাৎ সে-পথ যেন শেষ হয়ে গেল···

একদিন বিস্মিত নবদ্বীপবাসীরা শুনলো, শ্রীবাসের অঙ্গনে নিমাই-এর তুই পাশে নাচছে, জগাই আর মাধাই···

ক্রমশ কাজীর কাছে সংবাদ গিয়ে পৌঁছোলো, নিমাই-পণ্ডিত একদল লোক নিয়ে নবদ্বীপের পথে-পথে কীর্ত্তন গেয়ে বেড়ায়। নবদ্বীপবাসী হিন্দুরাই অভিযোগ জানালো, তাদের গোলমালে আর চীৎকারে বাস করা যায়না। সবচেয়ে আশঙ্কার কথা, নিমাই-এর সেই হট্টগোলের দলে ক্রমশ লোক বাড়ছে।



কাজি জিজ্ঞাসা করেন, তারা কি ব'লে চীৎকার করে ?

অভিযোগকারীরা জানায়, হরিবোল ব'লে তারা চীৎকার করে।

কাজী স্থির করেন, পৌত্তলিকতার এই নতুন ঢেউ বন্ধ করতে হবে।

যারা আপনার জন তারাই যদি ভুল বোঝে, বিধর্মী ভুল বুঝবে তা আর আশ্চর্য্য কি ?

নিমাই-এর সেই নতুন-আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রতিবেশী আর রাজা, দু-পক্ষই বিরূপ হয়ে উঠলো।

পথে-ঘাটে নাম-রত বৈষ্ণব দেখলেই লোকে তেড়ে আসে। লাঞ্ছনা করে।

যেখানে বৈষ্ণবেরা সমবেত হয়ে কীর্ত্তন করে, সেখানে কোথা থেকে দলের পর দল এসে মার-ধোর আরম্ভ করে, খোল কেড়ে নেয়, মৃদঙ্গ ভেঙে ফেলে।

ভয়ে অধিকাংশ লোক পিছিয়ে যায়। মনে সাধ হলেও মুখে আর তারা নাম উচ্চারণ করেনা।

নিমাই যখন শুনলেন সে-নির্য্যাতনের কথা, নিজের স্কন্ধে নিলেন তার সমস্ত দায়িত্ব। বললেন, আমি নিজে বেরুবো নগর-সংকীর্ত্তনে এবং যাবো সর্বপ্রথম কাজীরই বাড়ীতে।

ভক্তরা ভীত হয়ে ওঠে, বারণ করে।

পুরুষসিংহ হেসে বলেন, বৈষ্ণবের ধর্ম্ম—ভীরুর ধর্ম্ম নয়। যে-অন্তরে ভগবানকে বসাবো, সে-অন্তর মানুষের হুমকিতে ভীত হবে ? ভালোবাসার মধ্যে ভয় নেই, আক্রোশ নেই।

নিমাই বাহির হন নগর-সংকীর্ত্তনে।

নিমাই আজ নিজে নগর-সংকীর্ত্তনে বাহির হবেন, এই সংবাদ পেয়ে বহু লোক এসে সমবেত হলো।

সকলকে নিয়ে নিমাই আজ বেরুলেন পথে।

তাঁর দিব্যকণ্ঠস্বর থেকে মধুর হরিনাম নবদ্বীপের বাতাসকে যেন প্রাণময় ক'রে তুললো। কীর্ত্তনের মধ্যে তাঁর দেহ এমন বিচিত্র ছন্দে দুলে উঠতে লাগলো যে, এমন অঙ্গ-লীলা মানুষ আর কখনো দেখিনি। তাঁর প্রেরণায় তাঁর সঙ্গে যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও



নিজের-নিজের দেহে সেই অপরূপ ছন্দকে রূপ দিলেন। কণ্ঠের মিলিত স্বরের সঙ্গে সেই জনতার দেহের লাস্যময় ছন্দ মিলিত হয়ে পথে-পথে যেন মহাভাবের স্থলপদ্ম ফুটিয়ে চলতে লাগলো। যারা ব্যঙ্গ ক'রে দূরে ছিল, তারাও সেই বিদ্যুৎ-তরঙ্গে আকৃষ্ট হয়ে পড়লো। কোথা থেকে কেমনভাবে সেই মুষ্টিমেয় লোক ক্রমশ সহস্র লোকের জনতায় পরিণত হলো, কেউ তা জানতে পারলো না। পথের দু'ধারে বাতায়ন খুলে যায়। প্রতি গৃহের ভিতর থেকে পুরনারীরা সেই দিব্য দেহের তরঙ্গ দেখে অন্তর থেকে হুলুধ্বনি দিয়ে ওঠেন। ক্রমশ মানুষের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে, মৃদঙ্গের রোলের সঙ্গে মিশে যায় শত-শত পুরনারীর মঙ্গল শঙ্খধ্বনি। দেখতে-দেখতে অপরাহ্ন হয়ে আসে। ক্রমশ সমস্ত নবদ্বীপ যেন ঘর ছেড়ে পথে সেই দেহ-তরঙ্গের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দেয়। আকাশ-বাতাস এক মহাপ্রাণতরঙ্গে শব্দময় হয়ে ওঠে। এইভাবে নিমাই যখন কাজীর প্রাসাদের নিকট উপস্থিত হলেন, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। সে-অন্ধকারে সেই শত-সহস্র লোকের জনতা···প্রত্যেকে হাতে মশাল জ্বেলে ধ'রে। যেন আজ নবদ্বীপের অন্তর সেই অসংখ্য মশালের আলোয় ঊর্দ্ধ-গগনের দিকে তার সান্ধ্যপ্রণাম নিবেদন করতে চলেছে।

প্রাসাদের অলিন্দে দাঁড়িয়ে কাজী শোনেন, যেন সমুদ্র গর্জ্জন করতে-করতে সেই দিকে এগিয়ে আসছে···ক্রমশ দেখেন, সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে শত-সহস্র মশাল সেই দিকে এগিয়ে আসছে···

কাজীর মনে আশঙ্কা হলো, নবদ্বীপ বুঝি বিদ্রোহী হয়ে তাঁকে আক্রমণ করতে এসেছে। তাঁর কাছে এত সৈন্য নেই যে, সেই বিশাল জনতাকে রোধ করেন। তিনি ভয়ে প্রাসাদের ভেতরে লুকিয়ে পড়েন।

প্রাসাদের দ্বার-প্রান্তে এসে নিমাই ডাকেন, কোথায় বন্ধু? কোথায় তুমি? আমি এলাম পথশ্রম ক'রে তোমার দ্বারে, তুমি কিনা ভেতরে রইলে লুকিয়ে?

নিমাই-এর সেই প্রেম-আহ্বানে কাজী উপস্থিত হন। নিমাই দু'বাহু প্রসারিত করে কাজীকে আলিঙ্গন করেন। বলেন, তুমি আমার সঙ্গে বিচার করো, কি অন্যায় আমি করেছি। অন্যায় যদি ক'রে থাকি, নিশ্চয়ই তোমার শাস্তি মাথা পেতে নেবো।

*নিমাই-এর সঙ্গে আলাপ ক'রে কাজী নিজের ভুল বুঝতে পারেন, বলেন, আজ থেকে নাম-সংকীর্ত্তনে কেউ বাধা দেবেনা নবদ্বীপে।

আনন্দে নৃত্য করতে-করতে ফিরে যায় বৈষ্ণবেরা যে যার ঘরে।

একুশ

নিমাই-এর মনে জেগে ওঠে তীব্র বাসনা, সারা বাংলায় এমনি দ্বারে-দ্বারে গিয়ে বিরূপ মনের সামনে তিনি ভক্তির অর্ঘ্য নিয়ে দাঁড়াবেন। জীবনের সেই একমাত্র কামনা। সংসারের এই ছোট্ট সীমানার বাইরে তাঁকে ডাকছে বাইরের বৃহৎ জগৎ। তার জন্যে দরকার, সন্ন্যাস। নিমাই নিজেকে মনে-মনে তৈরী করেন সেই সন্ন্যাসের জন্যে। কিন্তু, কে দেবে দীক্ষা ?



—কাজী নিজের ভুল বুঝতে পারেন—

এইসময় একদিন রাত্রির স্বপ্নে দেখলেন, দীর্ঘকায় এক সন্ন্যাসী তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়ে। সন্ন্যাসীর মুখ থেকে যেন স্নেহ-ভালোবাসা আলোর মতন ঠিকরে পড়ছে। স্বপ্নের ঘোরে নিমাই ব'লে ওঠেন, এই তো আমার দীক্ষা-গুরু !



সেই স্বপ্ন দেখার পর থেকে নিমাই অনবরত যেন আকুল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন, যেন অষ্টপ্রহর কাকে খুঁজছেন! এমন সময় একদিন এক সন্ন্যাসী তাঁরই বাড়ীর দরজায় ভিক্ষার জন্যে উপস্থিত হলেন। নিমাই-এর চোখে পড়তে নিমাই অবাক হয়ে গেলেন, এই তো সেই সন্ন্যাসী, যাঁকে তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন!

পরিচয় নিয়ে জানলেন, সন্ন্যাসীর নাম—কেশব-ভারতী। কাটোয়ায় তাঁর আশ্রম।

কেশব-ভারতী বলেন, নিমাই-এর পাণ্ডিত্য আর অপরূপ গুণের কথা শুনে তাঁকে দেখবার জন্যেই তিনি এসেছেন।

নিমাই সেদিনটির মত কেশব-ভারতীকে নিমন্ত্রণ ক'রে তাঁর বাড়ীতে রেখে দিলেন। বাড়ীর সকলে যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন গভীর রাত্রিতে নিমাই আর কেশব-ভারতী অন্তরঙ্গভাবে দু'জনে ধর্ম্মালোচনা করেন।

নিমাই-এর সেই বিশুদ্ধ ভক্তি আর ভালোবাসার কথা শুনে কেশব-ভারতী বিমুগ্ধ হয়ে যান। নিমাই-এর দেহ লক্ষ্য ক'রে দেখেন, তাতে দিব্য লক্ষণ সব পরিস্ফুট। হাত জোড় ক'রে কেশব-ভারতী বলেন, প্রভু, আমি জানি তুমি নারায়ণের অবতার।

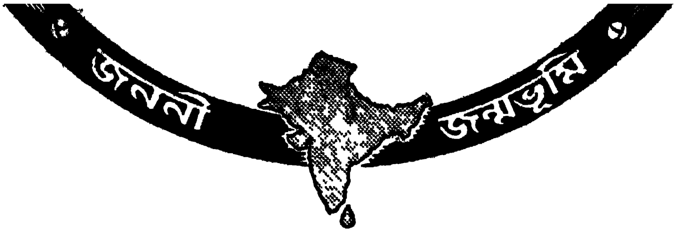
নিমাই একান্ত বিনীতভাবে কেশব-ভারতীর সেই শ্রদ্ধা গ্রহণ করেন। কিন্তু বলেন, তবুও আপনি হবেন আমার দীক্ষা-গুরু। শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে আমি আপনার কাছ থেকে নেবো সন্ন্যাসীর দীক্ষা—সারা ভারতবর্ষে প্রচার ক'রে বেড়াবো ভালোবাসার ধর্ম্ম।

কেশব-ভারতী রাজী হন। নিমাই-এর মন থেকে যেন একটা ভার নেমে যায়।

বাইশ

নিমাই স্থির সংকল্প করেন মনে, সংসার ত্যাগ করবেন। এই ছোট্ট গণ্ডী পেরিয়ে বিশ্ব-জগতে তিনি বেরিয়ে পড়বেন!

কিন্তু সংসারের দিকে চেয়ে দেখেন, সেখানে দুটি অপরূপ নারী একমাত্র তাঁরই দিকে চেয়ে, অন্তরের সহস্র মায়ার বন্ধন দিয়ে তাঁকে বেঁধে রেখেছেন। একজন জননী, আর-একজন জায়া। শচীমা আর বিষ্ণুপ্রিয়া! মা মাত্রেই স্নেহময়ী, পুত্রকাতরা। কিন্তু শচীমা যে নিমাই ছাড়া জগতে আর কিছুই জানেন না। তাঁর ঘর, তাঁর মন্দির,



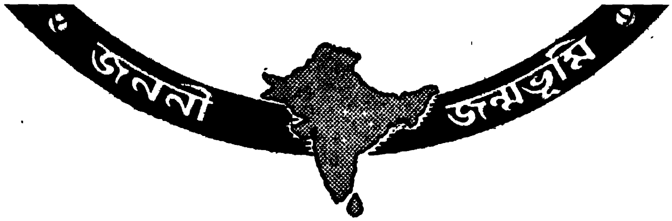
তাঁর মন, সমস্ত আচ্ছন্ন ক'রে রয়েছে তাঁর নিমাই। আর, বিষ্ণুপ্রিয়া! স্বামীই তাঁর দেবতা, স্বামীই তাঁর ধ্যান, স্বামীই তাঁর জ্ঞান, স্বামীর পায়ে এক-কণা ধূলো লাগলে বিষ্ণুপ্রিয়ার সারা মন উদ্বেল হয়ে ওঠে। তুই নারী তুই দিক থেকে অসীম মমতায় নিমাইকে বেঁধে রেখেছেন সংসারের সঙ্গে। সে-বাঁধন নিজের হাতে ছিঁড়ে চলে যেতে হবে নিমাইকে। ভালোবাসা ছাড়া যাঁর মনে আর কোনো চেতনাই নেই, কি ক'রে তিনি এত-বড় বেদনার আঘাত দেবেন?

ক্রমশ গৃহ-ত্যাগের দিন এগিয়ে আসে। শচীমা আর বিষ্ণুপ্রিয়া ইদানিং নিমাই-এর হাব-ভাব দেখে মনে-মনে বুঝেছিলেন, নিমাই যেন তাঁদের কাছ থেকে বহু দূরে স'রে গিয়েছেন.। কিন্তু তাঁর ব্যবহারে সে-কথা আবার মন থেকে আপনা হতে মুছে যেতো। নিমাই-এর স্নেহ-ভালোবাসার মধ্যে এতটুকু ফাঁক কোথাও ছিলনা।

গৃহত্যাগের সংকল্পের কথা নিমাই কাউকেই বলেন নি। নিঃশব্দে এই বন্ধন ছিঁড়ে চলে যেতে হবে। শচীমাকে বহুরকমে তিনি বোঝাতে চেষ্টা করেন, একদিকে তিনি যেমন তাঁর ছেলে, তাঁর সঙ্গে তাঁর প্রাণের যোগ, তেমনি জগতে যেখানে যে আছে, তার প্রাণের সঙ্গে আছে তাঁর সংযোগ। সেখানে তাঁব একটা বড় কর্ত্তব্য আছে। সে কর্ত্তব্য পালন করার জন্যেই তাঁর আসা।

বিষ্ণুপ্রিয়াকেও তিনি নানাভাবে সান্ত্বনা দেন। যে যাকে ভালোবাসে, সে যত দূরে চলে যাক্ না কেন, সে তারি থাকে। জগতের প্রত্যেক লোককেই তিনি ভালোবাসেন, আর সেইসব ভালোবাসার ভেতর দিয়ে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়ার ভালোবাসাকেই বড় ক'রে দেখেন। অন্তর জুড়ে যে থাকে, বাইরে সে কোথাও হারিয়ে যায়না। বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁর মনের দিকে চেয়ে দেখলেই দেখতে পাবেন, সেখানে নিমাই তেমনি স্নেহে রয়েছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া বুঝতে পারেন, বিদায়ের দিন এগিয়ে এসেছে। নিমাই যত সান্ত্বনা দেন, ততই বিষ্ণুপ্রিয়ার তুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। ঘুমের মধ্যেও বিষ্ণুপ্রিয়ার তুই চোখের কোণ বেয়ে জল ঝ'রে পড়ে।

ক্রমশ সেই মহা-দিন এগিয়ে এলো। গভীর রাত্রিতে নিমাই শয্যা থেকে উঠে



বসলেন। দেখলেন, বিষ্ণুপ্রিয়া ঘুমের মধ্যে কাঁদছেন। নীরবে শয্যা থেকে উঠে দাঁড়ান, একপা-একপা ক'রে দরজার কাছে আসতে তাঁর বুক বেদনায় ভেঙে পড়ে। অসীম সংযমে নিজেকে সংযত ক'রে নিমাই নিদ্রিতা-জননীর মাথার শিয়রে এসে দাঁড়ান। নীরবে জননীর চরণ-ধূলি নিয়ে রাত্রির অন্ধকারে নবদ্বীপের রাস্তায় নেমে পড়েন। আর পেছনের দিকে ফিরে চাননা। কাটোয়ার দিকে অগ্রসর হন।

ভোর না হতেই নবদ্বীপ জানতে পারলো, নিমাই নবদ্বীপ ছেড়ে চলে গিয়েছে। শচীমা উন্মাদিনীর মতন চীৎকার ক'রে ওঠেন, নিমাই, নিমাই! হা-নিমাই!

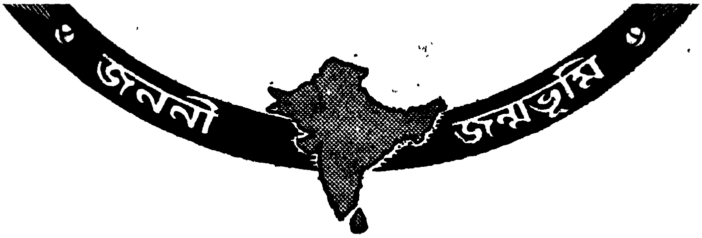
সে-কান্নায় নবদ্বীপ কেঁদে ওঠে। বিষ্ণুপ্রিয়া ঘুম থেকে উঠে সবই বুঝতে পারেন। মাটির দিকে চেয়ে দেখেন, দরজার সামনে মাটিতে রাত্রির শিশিরে নিমাই-এর চ'লে যাওয়া চরণ-চিহ্ন। গলায় আঁচল দিয়ে সেই চরণ-চিহ্নের ওপর লুটিয়ে পড়েন।

কেশব-ভারতী যথারীতি নিমাইকে দীক্ষা দিলেন। সুন্দর কুঞ্চিত-কেশ—মাথা থেকে মুড়িয়ে ফেলে দিলেন। সংসারীর চিহ্ন শ্বেতবস্ত্র ত্যাগ ক'রে গেরুয়া পরিধান করলেন। জগতের সকল সম্পদ ত্যাগ ক'রে শুধু নিলেন দণ্ড আর কমণ্ডলু। পুরাণো নামও ফেলে দিতে হলো। দীক্ষান্তে কেশব-ভারতী নতুন নাম দিলেন, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য।

দীক্ষা শেষ হ'লে শ্রীচৈতন্য, গুরু ব'লে কেশব-ভারতীর পদধূলি নিলেন। কেশব-ভারতী প্রত্যুত্তরে বললেন, আমার পরম সৌভাগ্য, আমি তোমার দীক্ষা-গুরু। তবুও তুমি আমার প্রণাম গ্রহণ করো···তোমার মধ্যে আমি যে দেখেছি আমার ভগবানকে।

শিষ্য হয় গুরু···গুরু হয় শিষ্য।

যখন এই সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো, নবদ্বীপ থেকে দলে-দলে লোক কাটোয়ায় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের দর্শনের জন্যে ছুটে এলো। তারা শ্রীচৈতন্যকে নবদ্বীপে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে কাতরভাবে মিনতি করে—কিন্তু শ্রীচৈতন্য বলেন, আমি বেরিয়েছি ভারতবর্ষের পথে, তীর্থে-তীর্থে, ভারতের শহরে-শহরে পরিভ্রমণ ক'রে আমি মানুষকে ভক্তির পথে, ভালোবাসার পথে, ভগবানের পথে ফিরিয়ে আনতে চললুম।



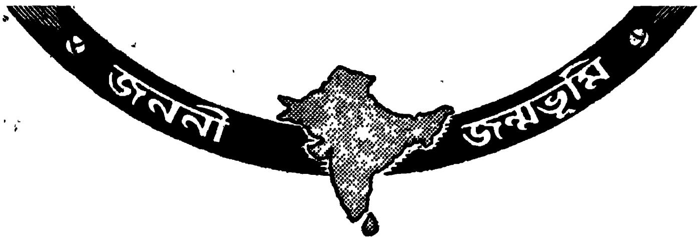
এমনিভাবে ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রয়োজনে, আমরা দেখেছি, বারেবারে মহাপুরুষেরা এসেছেন···এই বিরাট দেশের পথে-প্রান্তরে পরিভ্রমণ ক'রে মানব-ধর্ম্মের কথা প্রচার ক'রে গিয়েছেন। সেইসব মহাপুরুষের মধ্যে দিয়ে—এই নানা-প্রদেশে, নানা-ভাষা, নানা-আচার আর সম্প্রদায়ে বিভক্ত মহাদেশ তার অন্তর্নিহিত একত্ব উপলব্ধি করেছে। তাঁরা ভারতের যে-প্রদেশেই জন্মগ্রহণ করুন-না কেন, তাঁরা সবাই ছিলেন ভারত-পথের পথিক।

ভারত-পথিক শ্রীচৈতন্য বেরুলেন, নতুন ক'রে আবার ভারতের মর্মকথা প্রচার করতে। তাঁদের চলমান-জীবনই তাঁদের প্রচারকার্য্য। তাঁরা যে আদর্শ মুখে প্রচার করেন, জীবনে তাই আচরণ করেন। চলমান তীর্থের মতন তাঁদের জীবনে তাই মানুষ সন্ধান পায় অন্তর-দেবতার। আমাদের দেশে এইভাবে দেবতা এগিয়ে চলেন মানুষের কাছে।

প্রথমে এলেন শান্তিপুরে, অদ্বৈত-আচার্য্যের ভবনে। আচার্য্য দুই বাহু প্রসারিত ক'রে আলিঙ্গন করলেন। বললেন, তোমারি আশায় অপেক্ষা করে ছিলাম আমরা। আজ সার্থক হয়েছে আমাদের প্রতীক্ষা।

সেইখানে ছুটে আসেন, ভক্তদের সঙ্গে শচীমা। মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, মাগো, নীলাচলে আমি চললাম, সেখান থেকে আমার সংবাদ মাঝে-মাঝে তোমার কাছে পাঠাবো।

শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে চলে ভক্তের দল। যেখান দিয়ে যান, সেখানকার শুকনো মাটিতে যেন ফুটে ওঠে ফুল। পথের দু'ধারে ভক্তি আর ভালোবাসার কথা ছড়িয়ে চলেন শ্রীচৈতন্য। একটা মধুর আশ্বাস, একটা চরম বিশ্বাস জাগিয়ে তোলেন পীড়িত আর্ত্ত মানুষের বুকে। কোনো শাস্ত্রের কথা নয়, কোনো যুক্তির তর্ক নয়, শুধু বিশ্বাস আর ভালোবাসা। তুমি আছো আমার সঙ্গে-সঙ্গে আমার প্রতি রক্ত-কণিকায়-কণিকায়, তোমার অসীম ভালোবাসায় আমি আছি, আমার অসীম ভালোবাসায় তুমি আছো, তাইতো জগৎ এত সুন্দর, এত মধুর, অনির্বচনীয়। তাই তোমার নাম সবচেয়ে প্রিয়



নাম, তাই হে প্রিয়তম, নিশিদিন শুধু তোমার নামই কীর্ত্তন ক'রে চলি। নিত্য ধূপের মতন নিত্য উঠুক তোমার নাম-গান।

যে-পথ দিয়ে এগিয়ে চলেন শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য, সেই পথের দু'ধার থেকে জেগে ওঠে নামের সুরভি। ছুটে আসে চাষী, ছুটে আসে গৃহী, ছুটে আসে প্রাণী, ছুটে আসে মূর্খ, ছুটে আসে ধনী, ছুটে আসে নির্ধন, ছুটে আসে সিংহাসন থেকে নেমে রাজা, বহুদিনের ভুলে-যাওয়া সত্যকে আবার রূপ দিয়ে এগিয়ে চলেন শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য,—মানুষের মধ্যে নেই কোনো ভেদ, চণ্ডাল থেকে ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ পর্য্যন্ত সকলেরই আছে সমান অধিকার ভালোবাসার···ভালোবাসা পাবার।

নীলাচলে যাবার জন্যে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নৌকাতে আরোহণ করেন। সঙ্গে চলে একদল ভক্ত। তারা কিছুতেই তাঁর সঙ্গ ছাড়বেননা। মাঝিরা নৌকা ছেড়ে দেয়। শ্রীচৈতন্য নাম-গানে মেতে উঠেন।

হঠাৎ সেই অদ্ভুত সন্ন্যাসীর অদ্ভুত আচরণ দেখে মাঝিরা শঙ্কিত হয়ে ওঠে। বলে, এই পথ বড় বিপদসঙ্কুল। জলে চারিদিকে কুমীর, ডাঙায় ভীষণ সব বাঘ, আর ভয়ঙ্কর সব ডাকাত ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ-পথে তাই কোনো শব্দ করা চলবে না।

সে-কথা শুনে শ্রীচৈতন্য হেসে ওঠেন। বলেন, কোনো ভয় নেই, তারস্বরে করো নাম সংকীর্ত্তন!

মাঝিরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, কিন্তু কিছুক্ষণ যেতে না-যেতেই কোথা থেকে ঘুচে গেল তাদের মনের ভয়। দাঁড় ফেলার সঙ্গে-সঙ্গে তারাও যোগদান করে সেই নাম-সংকীর্ত্তনে। মহোল্লাসে যাত্রীর দল নির্বিঘ্নে উপস্থিত হয় উৎকলের মাটিতে। মাঝিরা লুটিয়ে পড়ে শ্রীচৈতন্যের পায়ে। মহাপ্রভু তাদের টেনে নেন বুকে। তারা কেঁদে বলে, প্রভু, যদি আবার এই পথ দিয়ে ফেরো, আমাদের নৌকো যেন পায় তোমার চরণ ধুলো!

সেখান থেকে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য পায়ে হেঁটে জগন্নাথধামের দিকে অগ্রসর হলেন।

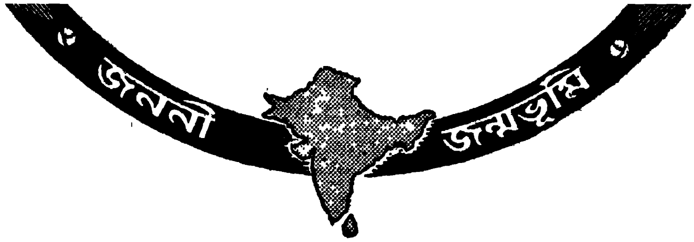
বালেশ্বর, যাজপুর হয়ে কমলপুরে পৌঁছোলেন। সেখানে চলতে-চলতে দূরে জগন্নাথদেবের মন্দিরের ধ্বজা চোখে পড়তে, মহাপ্রভু আবেগে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। নৃত্য করতে-করতে তিনি উল্লম্ফন ক'রে উঠেন, মনে হয়, যেন এই মুহূর্ত্তে লাফিয়ে জগন্নাথদেবের মন্দিরের সামনে উপস্থিত হবেন। যতই মন্দিরের কাছে এগিয়ে আসেন, ততই অন্তরের অনুরাগ প্রবলতর হয়ে ওঠে। নীলসিন্ধুর তীরে যিনি অপেক্ষা ক'রে রয়েছেন, তাঁর বুকে পৌঁছোবার জন্যে অধীর বিরহ জেগে ওঠে। পথের মাঝখানেই বিরহে জ্ঞানহারা হয়ে লুটিয়ে পড়েন। জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে শিশুর মতন আকুলভাবে কেঁদে উঠেন, কই, আর কতদূরে তুমি? কতদূরে তোমার ঘর?

পথের দু'ধারে লোক কাতারে-কাতারে এসে জড়ো হয়। এমন অপূর্ব মানুষ, এমন অপূর্ব অনুরাগ আর তারা কখনো দেখেনি। তারা বলাবলি করে, মন্দিরে বিগ্রহের মধ্যে যিনি আছেন, তিনিই আজ মানুষের মূর্ত্তি ধ'রে সেই বিগ্রহের কাছে এগিয়ে চলেছেন। ভগবান চলেছেন ভগবানের কাছে।

অবশেষে মহাপ্রভু মন্দিরের চত্বরে এসে দাঁড়ান। সর্ব-দেহ তাঁর আবেগে থর্‌থর্‌ ক'রে কাঁপতে থাকে। মন্দিরের ঘরের সামনে গিয়ে উন্মাদের মতন তিনি বিগ্রহকে বুকে জড়িয়ে ধরবার জন্য ছোটেন। পাণ্ডারা চারদিক থেকে শশব্যস্ত হয়ে ছুটে এসে তাঁকে প্রহার করতে উদ্যত হয়। মহাপ্রভুর সেদিকে কোনো লক্ষ্যই নেই। তাঁর দুই চোখ দিয়ে তখন দরধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। তাঁর চোখের সামনে তখন বিশ্বভুবনেশ্বর ছাড়া আর কেউ নেই।

সৌভাগ্যবশত সেখানে রাজপণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য উপস্থিত ছিলেন, তিনি তাড়াতাড়ি মহাপ্রভুকে আগলে ধরলেন, নইলে সেদিন জগন্নাথদেবের পাণ্ডারা তাঁর মানবী-মূর্ত্তিকে তাঁর সামনেই প্রহারে জর্জ্জরিত করতো।

সার্বভৌম ছিলেন উৎকলের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, বেদান্তের মহা-আচার্য্য। মহাপ্রভুর সেই অনুরাগের আধিক্য দেখে সার্বভৌমের বাসনা হলো, তাঁকে বেদান্তের শিক্ষা দেবেন, জ্ঞানের তত্ত্ব বোঝাবেন।



মহাপ্রভু সে-কথা শুনে আচার্য্যের কাছে উপস্থিত হলেন এবং বিনীত শিষ্যের মতন আচার্য্যের বেদান্ত-ব্যাখ্যা শুনতে লাগলেন। চৌদ্দ-পনেরো দিন ধ'রে সার্বভৌম বেদান্তের ব্যাখ্যা ক'রে চলেছেন, মহাপ্রভু শুধু নীরবে শুনে যাচ্ছেন। অবশেষে একদিন সার্বভৌম সন্দিগ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আজ পনেরো দিন ধ'রে আমি তোমাকে বেদান্তের নানা দুরূহ সূত্র ব্যাখ্যা ক'রে চলেছি, কিন্তু, তুমি একবারও তো কোনো প্রশ্ন করলেনা? তুমি যদি না বুঝে থাকো, তাহ'লে আমাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করতে পারো, কিন্তু, এ-রকম নীরব থাকার অর্থ কি?

মহাপ্রভু তখন একান্ত বিনীতভাবে বললেন, আপনি যেভাবে ব্যাস-সূত্রের ব্যাখ্যা করলেন, তা তো ঠিক হলোনা?

সার্বভৌমের মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়লো। তখন মহাপ্রভু একে-একে ব্যাস-সূত্রের ব্যাখ্যা করলেন। সেই ব্যাখ্যা শুনে সার্বভৌম বুঝতে পারলেন, তিনি কাকে জ্ঞান-শিক্ষা দিতে গিয়েছিলেন! লজ্জায় তিনি মহাপ্রভুর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন, বললেন, না জেনে অপরাধ করেছি, ক্ষমা করবেন প্রভু!

মহাপ্রভু আনন্দে বুকে টেনে নেন সার্বভৌমকে। ভাগবৎ থেকে শ্লোক উদ্ধৃত ক'রে তাঁকে বুঝিয়ে দেন, ভক্তির মর্ম।

সেখান থেকে মহাপ্রভু যাত্রা করেন, দাক্ষিণাত্যের দিকে।

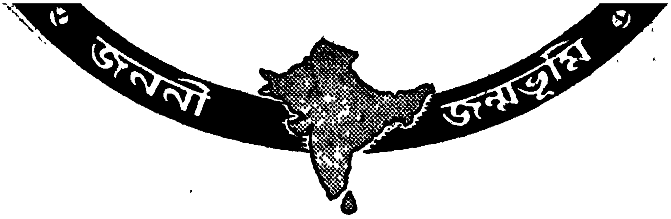
দাক্ষিণাত্যে বহু তীর্থে, বহু দেশে পরিভ্রমণ ক'রে মহাপ্রভু আবার ফিরলেন উৎকলে।

তিনি ফিরে এসেছেন শুনে, উৎকলের অধিপতি রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁকে দর্শন করবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

মহাপ্রভু কিন্তু রাজ-দরবারে যেতে সম্মত হলেননা! তখন প্রতাপরুদ্র নিজে ছদ্মবেশে তাঁর প্রজাদের সঙ্গে পথে এসে মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। ধূলোয় লুটিয়ে মহাপ্রভুকে প্রণাম করলেন।

মহাপ্রভু সকলের মতন তখন তাঁকে বুকে টেনে নিলেন।

সেখান থেকে মহাপ্রভু পায়ে হেঁটে এবার উত্তর-ভারতে যাত্রা করলেন। বারাণসী,



বৃন্দাবন পরিভ্রমণ ক'রে তিনি আবার ফিরলেন নীলাচলে। এবং সেখানেই জগন্নাথদেবের মন্দিরের ছায়ায় অষ্টাদশ বর্ষ কালযাপন করলেন।

প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময় মহাপ্রভুকে কেন্দ্র ক'রে বাংলা আর উৎকল মিলিত হতো। প্রতিবৎসর এইসময় বাংলা থেকে বৈষ্ণব-ভক্তরা এসে মহাপ্রভুর সঙ্গে কীর্ত্তন-আনন্দে চার মাস কালযাপন করতেন।

এই পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে প্রতিবৎসর সারা ভারতবর্ষ থেকে আপামর জনসাধারণ এসে এই মহাপুরুষের সাক্ষাৎ স্পর্শ লাভে ধন্য হতো। দিনের পর দিন মহাপ্রভুর প্রেম-তরঙ্গ যেন উদ্বেল হয়ে উঠতে লাগলো। ক্রমশ এমন অবস্থা হলো যে, তিলেকের জন্যে কৃষ্ণ-দর্শন না হ'লে বিরহে জ্ঞানহারা হয়ে উঠতেন।

একদিন পূর্ণিমায় আকাশে পূর্ণচন্দ্র উঠেছে, তার রূপালী-আলো সমুদ্রের নীল জলে প'ড়ে সমুদ্রের নীলকে অপরূপ ক'রে তুলেছে। কৃষ্ণ-নামে মত্ত মহাপ্রভু, হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ, করতে-করতে সেই পূর্ণিমার আলো-উদ্ভাসিত সমুদ্রের ধারে এসে দাঁড়ালেন। সমুদ্রের সেই নীলকান্ত রূপের দিকে চেয়ে দেখে মনে হলো, নীলকান্ত পরমপুরুষ যেন অদূর সমুদ্র-তরঙ্গে দাঁড়িয়ে তাঁকে আহ্বান করছে। মহাপ্রভু বাহ্য-জ্ঞানহারা হয়ে, প্রিয়তম ইষ্ট-দেবতার সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে পূর্ণিমার তরঙ্গ-উদ্বেল সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

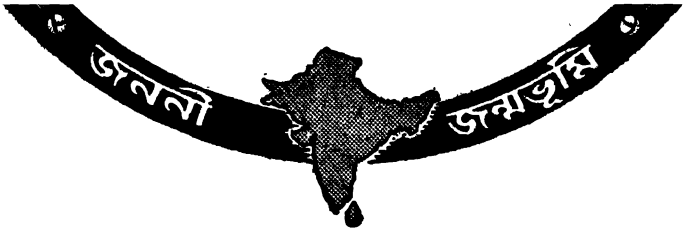
পূর্ণিমার নীল-সাগর টেনে নিলো তাঁকে তার সুনীল অন্তরে।





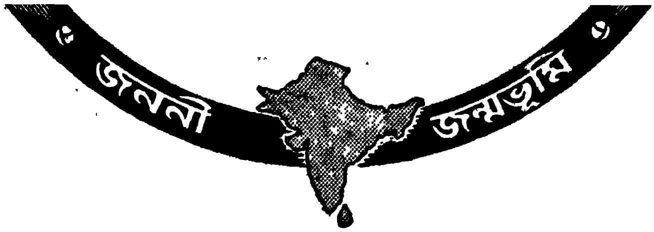
ম্যাক্‌সিম্ গর্কী

ম্যাক্‌সিম্ গর্কী বর্ত্তমান রাশিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক। এই বিশ্ব-সংসারে যে কোটী-কোটী লোক দুঃখ, দারিদ্র্য আর দুর্ভাগ্যের তাড়নায় জীবনের রাজপথ থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হয়, ম্যাক্‌সিম্ গর্কী সেই হতভাগ্য বঞ্চিতদের প্রাণের বেদনার কথাকে তাঁর সাহিত্যে রূপ দিয়েছেন। যাদের কথা কেউ বলেনা, যারা নিজেদের কথা বলতে জানেনা, গর্কী তাদের প্রতিনিধি হয়ে তাদের কথাকেই বাণীরূপ দিয়েছেন, তাঁর সমস্ত রচনার মধ্যে এই 'মা' নভেল খানিই জগতে সকলের পরিচিত। রাশিয়া যখন জারের শাসনে ছিল, সেই সময় ১৯০৫ সালে একবার রাশিয়াতে বিপ্লবীরা মাথা তুলে জাগে। কিন্তু সে-বিপ্লব তখন সার্থক হতে পারেনি। 'মা' নভেলে গর্কী সেই বিপ্লবের ভেতরের কথাকে রূপ দিয়েছেন, এই নভেলখানি সেই যুগের রুশ-তরুণদের



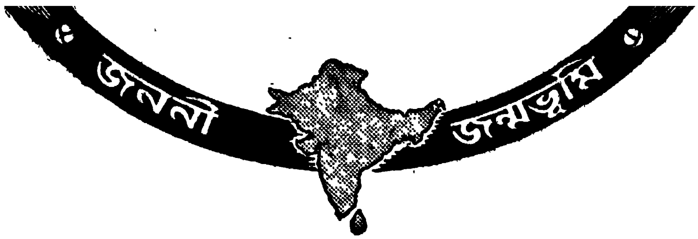
গীতার মতন ছিল। এই বইয়ে গর্কী একটা যুগের রুশ-তরুণদের বিপ্লবের আদর্শে দীক্ষিত করে তোলেন। রাশিয়ার বর্ত্তমান ইতিহাসে তাই এই নভেলটির প্রভাব অনন্যসাধারণ। গল্পের দিক থেকে গর্কী এক অশিক্ষিত গ্রাম্য-নারীর জীবনের মধ্য দিয়ে যেভাবে জগৎ-সংসারকে দেখিয়েছেন, ছেলের স্নেহের মধ্য দিয়ে মা ক্রমশ যেভাবে নিজেকে ছেলের কাজে উৎসর্গ করলেন, সেই অপূর্ব্ব সুন্দর মাতৃরূপ বিশ্ব-সাহিত্যে একটি সুন্দরতম সৃষ্টি। এখানে সংক্ষেপে তোমাদের সেই জগৎখ্যাত নভেলের গল্পটি বলছি---

পাভেলের বাবা কারখানার একজন সাধারণ মজুর ছিল, মজুরদের জীবন যেমন কারখানার চাকার সঙ্গে বাঁধা, তার জীবনও সেইরকম ছিল। ভোর না হতেই কলের 'সিটি' বাজার সঙ্গে-সঙ্গে ঘুম-চোখে বিছানা থেকে উঠে কলে গিয়ে ঢুকতো, সারাদিন কারখানায় কয়লার সঙ্গে পুড়ে সন্ধ্যার মুখে আবার কল থেকে বেরিয়ে আসতো। শরীরের যা-কিছু রস, সবই চুষে নিতো যন্ত্র। ক্লান্ত দেহে পথে ফেরবার সময় তাড়ির আড্ডায় গিয়ে ঢুকতো। আকণ্ঠ তাড়ি খেয়ে মাতাল হয়ে গভীর রাত্রে বাড়ী ফিরতো। পাভেলের মা রাত জেগে ভাত নিয়ে বসে থাকতেন। তন্দ্রায় একটু অন্যমনস্ক হ'লে সেই সময় যদি পাভেলের বাবা এসে পড়তো, রাগে স্ত্রীকে প্রহার করতো, মার খেয়ে, ভয়ে পাভেলের মা একটা কথাও বলতেন না। তিনি ধরে নিয়েছিলেন, তাঁর মতন গরীবের মেয়ের এই ভাগ্য, তাই চুপটি করে তা সহ্য করতেন। কখন-কখন মনে খুব কষ্ট হ'লে কাতরভাবে পাভেলের বাবাকে মদ খেতে বারণ করতেন, কিন্তু পাভেলের বাবা তা কানে তুলতোনা, উল্টে রেগে মারধোর করতো। এইভাবে প্রতিদিন সেই কারখানা আর তাড়িখানা আর মাতলামো করতে-করতে পাভেলের বাবা হঠাৎ একদিন মারা গেল। পাভেল তখন বালক। মা এখন সেই ছেলেটির দিকে চেয়ে বুকে পাথর বেঁধে কোনরকমে দুঃখের সংসার চালান। কুলী-মজুরের ছেলে, অতি সামান্য লেখা-পড়া শিখেছিল, একটু বয়স হতেই পাভেল বাপের জায়গায় কারখানায় মজুরী করতে ঢুকলো।



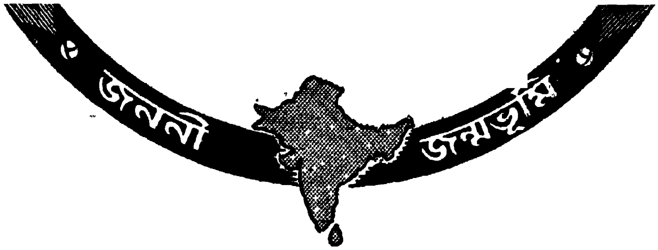
কারখানায় কাজ করতে-করতে, মজুরদের সেই বদ-সঙ্গে থেকে তার সব বদগুণ অল্প বয়স থেকে মনে ছেয়ে বসতে লাগলো। তার বাবা যেভাবে জীবন যাপন করে গিয়েছে, সে-ও ঠিক তেমনি জীবন যাপন করতে লাগলো। তেমনি রোজ রাত্তিরে মাতাল হয়ে বাড়ী ফেরা, আবার ভোর হলে কলের সিটি বাজার সঙ্গে-সঙ্গে কলে গিয়ে ঢোকা। মা কেঁদে বলতেন, হ্যাঁরে, তোর বাবা সারা জীবন জ্বালিয়ে গেল, তুইও আবার তোর এই দুঃখিনী-মাকে জ্বালাবি! ছেলের আড়ালে রাত-দিন ঠাকুর-দেবতার কাছে মা কত মিনতি জানান, কত প্রার্থনা করেন, ওগো দয়াময়, এই দুঃখিনীর ছেলেকে সুমতি দাও। এই-ভাবে কয়েক বছর যাবার পর হঠাৎ মা লক্ষ্য করলেন, তাঁর পাভেলের চাল-চলনে যেন ভয়ানক পরিবর্ত্তন এসে গিয়েছে! সে আর মদ খায়না, পাড়ার বদ্‌মায়েস ছেলেদের সঙ্গে মেশেনা, তাঁর সঙ্গেও ঝগড়া করে-না। তার কথাবার্ত্তাগুলোও কেমন যেন ভদ্রলোকদের মতন হয়ে গিয়েছে! এক দিন রাত্তিরে মা জেগে উঠে দেখেন, পাভেল রাত জেগে বই পড়ছে। এমনি-ধারা সে রোজ রাত্তিরেই পড়ে। লেখা-পড়া মা আদৌ জানতেননা। বাইরের সংসারের কোন খবরই জানতেননা। ছেলের এই পরিবর্ত্তনে তিনি মনে-মনে খুসী হলেও কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। আগে যে ছেলে মদ খেয়ে বাড়ী এসে


তুইও এই দুঃখিনী মাকে জ্বালাবি?



তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করতো, তাকে তিনি চিনতেন, কিন্তু এই যে রাত-জেগে বই-পড়া ছেলে, একে তিনি বুঝতে পারেননা, চিনতে পারেননা! কি এক অজানা আতঙ্ক তাঁর মনে ছেয়ে বসে। ক্রমশ দেখলেন, সন্ধ্যার পর তাঁর বাড়ীতে একটি দুটি করে অন্য ছেলেরা আসতে লাগলো। তাদের সঙ্গে দুটি-একটি মেয়েও আসতে আরম্ভ করলো। রান্নাঘরে কাজ করতে-করতে মা কান খাড়া করে তাদের কথা শোনেন, কিছুই বুঝতে পারেননা।

মাঝে-মাঝে ছাখেন, তাঁর ছেলে আর লিটল রাশিয়ান ব'লে আর-একটি ছেলে রেগে কি-সব বক্তৃতা দেয়। সেই বক্তৃতা থেকে মা বুঝতে পারেন, ওরা যেন কার ওপর খুব রেগে গিয়েছে, কে যেন খুব অন্যায় করেছে, তাঁর ছেলেরা সেই অন্যায়ের শাস্তি দেবে! ভয়ে তাঁর ঘুম চলে যায়, কে অন্যায় করলো? কে তাঁর ছেলের ওপর অত্যাচার করছে? কার কথা এরা বলছে? একদিন লিটল রাশিয়ান ছেলেটি আগে এসে পড়েছিল, মা ভয়ে আর লজ্জায় তাদের সামনে বেরুতেন না। দেখলেন, লিটল রাশিয়ান সোজা তাঁর কাছে চলে এলো, পাভেল যেমন এক-একদিন আদর করে তাঁর কোল ঘেঁসে বসতো, লিটল রাশিয়ানও তেমনি তাঁর কোল ঘেঁসে বসে পড়লো, মা'র মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠলো, মাগো, তোকে দেখে আমার মা'র কথা মনে পড়ে। মার মন থেকে ভয় চলে যায়। লিটল রাশিয়ান নিজের দুঃখময় জীবনের গল্প মাকে বলতে আরম্ভ করে। তার নিজের মা তাকে শিশু অবস্থায় রাস্তায় ফেলে দিয়ে চলে যায়, সেই থেকে অনাথ বালকের মতন সে মানুষ হয়েছে। তার কথা শুনতে-শুনতে মার মনে স্নেহরস উথলে ওঠে! যে স্নেহ ছেলেটি জীবনে পায়নি, সেই স্নেহ দেবার জন্যে মাতৃ-হৃদয় উথলে ওঠে। এইভাবে ক্রমশ দলের সকলের সঙ্গে মা'র আলাপ হয়। দেখেন, কি চমৎকার সব ছেলে-মেয়ে! বিশেষ করে, নাটাকা মেয়েটিকে তাঁর নিজের মেয়ের মতন মনে হয়। ক্রমশ একটু-একটু করে তাদের কথাবার্তা মা বুঝতে পারেন। লিটল রাশিয়ান তাঁকে দেশের অবস্থার কথা বুঝিয়ে বলে। এমনিধারা হাজার-হাজার ঘরে মানুষ শিক্ষার অভাবে, অন্নের



অভাবে মারা যাচ্ছে, অথচ তাদের পরিশ্রমে কারখানার চাকা চলছে, তাদের পরিশ্রমে ক্ষেতে ফসল হচ্ছে, সেই ফসল থেকে ব্যবসায়ীরা লক্ষ-লক্ষ টাকা রোজগার করছে, আর তারা দিনের পর দিন না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মাছি-মশার মতন মরে যাচ্ছে। মা বুঝতে পারলেন, এরা সেই স্বদেশীর দল। এরা যে ব্রত নিয়েছে, তা যে খুবই মহৎ, তাতে মা'র কোন সন্দেহ থাকেনা! কিন্তু মা শুনেছে, জারের পুলিশ এইসব স্বদেশী ছেলেদের সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসনে পাঠিয়ে দেয়, কারাগারে বন্দী করে রেখে অসীম যন্ত্রণা দেয়, এমন কি, গুলি করে মেরে ফ্যালে। সেই ছবি মা'র মনে জেগে উঠতেই মা ভয়ে শিউরে ওঠেন। না-জানি, পুলিশের লোকেরা কি ভীষণ! বলতে-বলতে একদিন বাড়ীতে পুলিশ এসে হানা দিলো। মা শুয়েছিলেন, একজন পুলিশ সোজা তাঁর কাছে এসে রুলের গুঁতো দিয়ে বললো, এই বুড়ী, ওঠ, বাড়ী সার্চ্চ হবে! ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে মা ছাখেন, পুলিশের লোকগুলো খাতাপত্র, বই, বিছানা, সব ছুড়ে-ছুড়ে ফেলে দিলো, সমস্ত ঘরটাকে একেবারে তচ্‌নছ করে ফেললো। রাগে লিটল রাশিয়ান প্রতিবাদ করে ওঠে। পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টর ধমক দেয়, চোপরও, পাজী বদমায়েস! পাভেলের আর-একজন সঙ্গী সমান-ভাবে ইন্‌স্পেক্‌টরকে বলে, বদমায়েস কে? আমরা, না, তোমরা?

এই, কুকুরটাকে বাইরে নিয়ে যা! ইন্‌স্পেক্‌টর হুকুম দেয়।

মা থাকতে না পেরে কেঁদে ওঠেন। ইন্‌স্পেক্‌টর ঠাট্টা করে ওঠে, আরে মাগী···সব কান্না যে এখুনি কেঁদে ফেল্লি!

মা উত্তর দেন, বলি, হাগা বাছা, তুমিও মা'র পেটে জন্মেছো তো! এ-দেশ তো তোমারও জন্মভূমি···মানুষের দুঃখ কষ্ট বোঝোনা?

লিটল রাশিয়ান মাকে সান্ত্বনা দেয়, মাগো, জীবনে কত রূঢ় ব্যথা আছে, দাঁতে দাঁত দিয়ে সহ্য করতে হয়!

যাবার সময় লিটল রাশিয়ানকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল। মাকে কাছে ডেকে পাভেল বললো, মাগো, তোমাকে এসব সহ্য করতে হবে!



সেইদিন থেকে মা'র মনে এক বিরাট পরিবর্ত্তন এসে গেল। তুধের বাছারা এ-রকম হাসিমুখে তুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারছে, আর, তিনি পারবেননা? ছেলের কাজে ছেলেকে সহায়তা করবার জন্যে মা গোপনে নিজেকে তৈরী করেন। লুকিয়ে-লুকিয়ে বর্ণপরিচয় নিয়ে পড়তে আরম্ভ করেন। নাটাকা মেয়েটি তাঁকে ক্রমশ শেখাতে আরম্ভ করে। ক্রমশ মা দেখতে পান, তাঁর নিজের সংসারের বাইরে বিরাট দেশের ছায়া। তাঁরই মতন ঘরে-ঘরে দরিদ্র মায়েরা কাঁদছে, তাঁর ছেলের মতন, লিটল রাশিয়ানের মতন, নাটাকার মতন মেয়ে ঘরে-ঘরে এমনি তুঃখ-কষ্ট, লাঞ্ছনা ভোগ করছে। পাভেল বলে, মাগো, এক ছেলের বদলে সারাদেশজোড়া ছেলে পেলে!

একদিন পাভেলকেও পুলিশ ধরে নিয়ে গেল। মা'র ভেতরটা হাহাকার করে উঠলেও বাইরে তিনি চোখের জল ফেললেননা। মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, আমার ছেলেকে ধরে নিয়ে গিয়েছ তোমরা, কিন্তু, আমি মা বেঁচে আছি! আমার ছেলের অসমাপ্ত কাজ আমি করবো! পাভেলের দল কারখানায়-কারখানায় মজুরদের জাগাবার জন্যে গোপনে সব ইস্তাহার বিলি করতো। এইসব ইস্তাহারে অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে প্রাণের ভাষায় শ্রমিক-সর্বহারাদের জাগরণ-মন্ত্র লেখা থাকতো, পুলিশের লোকেরা সেই ইস্তাহার বন্ধ করবার জন্যে রুদ্রমূর্ত্তি গ্রহণ করলো।

পাভেলের মা খাবারওয়ালী সেজে খাবারের ঝুড়ির ভেতর সেইসব গোপন ইস্তাহার নিয়ে গিয়ে বিলি করতে লাগলেন। ঝুড়ি নিয়ে গিয়ে এক কোণে দাঁড়িয়ে মা হাঁকেন, গরম-গরম পাঁপর! যারা জানে, তাদের সঙ্গে মা'র চোখে-চোখে ইঙ্গিত হয়ে যায়। তারা হাতে তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করে, টাট্কা আছে? মা বলেন, কাল নিয়ে আসবো! এইভাবে মা আনন্দে ছেলের অসমাপ্ত কাজ করে বেড়ান, মনে-মনে ভাবেন, পাভেল যেদিন ফিরে এসে এইসব শুনবে, তখন আর ভীতু ব'লে মাকে ধমকাবে না···তার উপযুক্ত মা বলে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরবে!

যেদিন পাভেল জেল থেকে বেরিয়ে এলো, সেদিন আনন্দে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে মা বল্লেন, ওরে, আমি তোকে, জন্ম দিইনি, তুই-ই আমাকে জন্ম দিয়েছিস!



মাতৃ-গৌরবে পাভেল বলে, মাগো, আজ আমি কি করে বলবো, আমার কি আনন্দ! যে মা আমাকে জগতে এনেছে, সেই মাকে জগৎ-চলার পথে পাশে-পাশে পাওয়া, জীবনের সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য!

পাভেলের দলের কাজ পূরোদমে চলতে থাকে। ক্রমশ তাদের দলে গোপনে



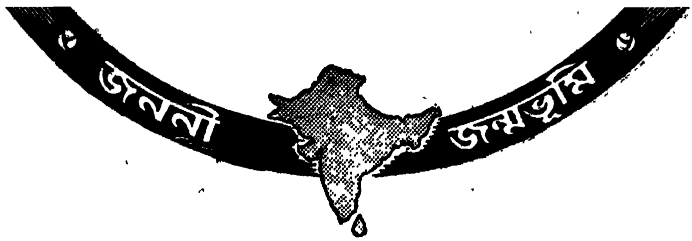
—হাতে তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করে, টাট্‌কা আছে?—

শত-শত লোক যোগদান করে। মা তাদের সঙ্গে সমানে কাজ করে চলেন। আজ আর ছেলেকে তিনি নিজের ছেলে বলে আলাদা করে দেখেন না। ক্রমশ পাভেল প্রকাশ্য বিপ্লব ঘোষণার জন্যে নিজেদের তৈরী করতে লাগলো। পুলিশের চরেরাও তৎপর হয়ে উঠেছিল। ক্রমশ বিপ্লবের দিন এগিয়ে এলো। শ্রমিকেরা সবাই গোপনে খবর পেয়েছিল। দলে-দলে তারা ময়দানে সমবেত হতে লাগলো। পাভেল তার দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। মা-ও তাদের সঙ্গে চল্লেন। তাঁর ছেলেরা চলেছে যুদ্ধ করতে, তিনি ঘরে বসে থাকবেন? দেখতে-দেখতে মাঠে বিরাট জনতা জমা হলো। পাভেল তাদের সম্বোধন করে বক্তৃতা দিতে উঠলো, কমরেড, আজ



আমরা যুগ-যুগ-সঞ্চিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে সমবেত হয়েছি। জগতে তুটিমাত্র জাত আছে, একটির নাম দরিদ্র, আর একটির নাম ধনী…এমন সময় জারের সৈন্যরা খোলা বেয়নেট নিয়ে আক্রমণ করলো, নির্ম্মমভাবে সুরু হয়ে গেল প্রহার। চারদিকে হৈ-চৈ জেগে উঠলো। তার মধ্যে পাভেল আর লিটল রাশিয়ান সমানে জনতাকে উত্তেজিত করে চলতে লাগলো। এমন সময় একজন পুলিশ পাভেলের হাত থেকে পতাকা কেড়ে নিয়ে বেয়নেটের গুঁতো দিয়ে তাকে ফেলে দিলো। পাথর হয়ে একধারে দাঁড়িয়ে মা দেখলেন, সৈন্যরা তাদের সকলকে ধরে নিয়ে গেল।

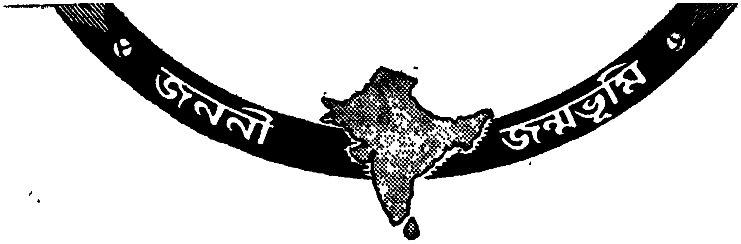
রাত্রিবেলায় পুলিশ এসে আবার তাঁর বাড়ী সার্চ্চ করলো। তাঁর ওপর নির্য্যাতন চলতে লাগলো! তখন দলের যারা বাকি পড়েছিল, তাদের সঙ্গে মা গোপনে গ্রাম ছেড়ে আর-এক সহরে এক ভাঙা বাড়ীতে এসে উঠলেন। সেখানে গোপনে বন্দী ছেলেদের হয়ে মা দলের কাজ করতে লাগলেন। সোফিয়া ব'লে একটি মেয়ে তাঁর সহায় হলো। নানা-রকম ছদ্মবেশে মা এক শহর থেকে আর-এক শহরে যাতায়াত করেন। শ্রমিকদের মধ্যে ইস্তাহার বিলি করেন। পাভেল বন্দী হলেও পাভেলের কাজ বন্ধ হলোনা। একদিন যে অশিক্ষিতা ভীরু নারী নিজের ঘরের কোণে ভয়ে-ভয়ে দিন কাটাতেন, আজ তিনি তুঃসাহসিক বিপ্লব-আয়োজনের সমস্ত গুরুভার নিজের কাঁধে তুলে নিলেন এবং তরুণ বিপ্লবীদের সঙ্গে সমানে কাজ করে চলতে লাগলেন। তাঁর পুত্রকে তারা বন্দী করে রেখেছে, কিন্তু তিনি তো মুক্ত আছেন। মা-কে কেন্দ্র করে বিপ্লবীর দল পূরো উদ্যমে কাজ করে চলে। কিন্তু মার মন পড়ে থাকে কারাগারের দিকে। সেখানে তাঁর পাভেল আর লিটল রাশিয়ান বন্দী হয়ে আছে। সবাই ছাড়া পেয়েছে, শুধু তারা তুজন বন্দী হয়ে আছে। না জানি, কারাগারে কি যন্ত্রণাই না তারা পাচ্ছে! এবং কতদিন যে এইভাবে তাদের কারাগারে আটক করে রাখবে, তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। অবশেষে মা সঙ্কল্প করেন, জেলের ভেতর থেকে তিনি তাদের উদ্ধার করে আনবেন। বিপ্লবীরা জেলের ভেতরে



তাদের দলের লোক ঠিক করে। তাদের মারফৎ কারাগারের ভেতর পাভেল আর লিটল রাশিয়ানের কাছে সংবাদ পৌঁছোয়। কিভাবে তারা কারারক্ষীদের চোখে ধূলো দিয়ে জেলের পাঁচিল টপকে পালাবে, তার সমস্ত আয়োজন মা বাইরে থেকে প্রস্তুত করেন। কিন্তু জেলের ভেতর যখন পাভেলের কাছে সংবাদ পৌঁছুলো যে, তাকে গোপনে জেল থেকে বার করে নিয়ে যাবার প্ল্যান হচ্ছে, পাভেল নিজেই প্রতিবাদ জানালো। গোপনে জেলের ভেতর তাদের লোক দিয়ে মাকে পাভেল একটা চিঠি লিখে তার সঙ্কল্পের কথা জানালে—আমরা যদি এইভাবে পালাই, তাহলে আমরা সহযাত্রীদের শ্রদ্ধা হারাবো। তার চেয়ে নতুন যে কৃষকটি ধরা পড়েছে, তাকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করুন, আমাদের সঙ্গীদের জেলে রেখে আমি পালাতে চাইনা! পুত্রের এই বীরত্বে মার বুক গর্বে ফুলে ওঠে। ক্রমশ পাভেল আর লিটল রাশিয়ানের বিচারের দিন উপস্থিত হলো।

বৃদ্ধবেশে মা নিজের চোখে সেই বিচার দেখবার জন্যে বিচারালয়ে উপস্থিত হলেন। বিচারের সময় বিচারকের প্রশ্নের উত্তরে পাভেল নির্ভীক-কণ্ঠে তার আদর্শের কথা ঘোষণা করলো, যতদিন ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে, ততদিন আমরা এইরকম বিদ্রোহী হয়ে থাকবো। যতদিন একদল লোক খাটবে, আর-একদল লোক হুকুম চালাবে, ততদিন আমরা এইরকম বিদ্রোহী হয়ে থাকবো। কোন শৃঙ্খল, কোন শাস্তি আমাদের আদর্শচ্যুত করতে পারবে না! বিচারক আদেশ দিলেন, নির্ব্বাসন চির-নির্ব্বাসন সাইবেরিয়ায়।

বাঘিনীর কাছ থেকে তার শাবককে কেড়ে নিয়ে গেলে বাঘিনী যে-রকম ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, পাভেলের নির্ব্বাসনের পর মা সেইরকম ক্ষিপ্ত হয়ে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করতে লাগলেন। ছুটীর দিন কারখানার সামনে দাঁড়িয়ে সেই বৃদ্ধা নির্ভীকভাবে সকলের হাতে ইস্তাহার দেন। বলেন, এই কথা প্রচার করার দরুণ আমার ছেলে নির্ব্বাসিত হয়েছে। কিন্তু আমরা আছি। আমরা নির্ব্বাসিত হ'লে আবার নতুন সব লোক আসবে···আমাদের স্থান খালি থাকবে না। এমন সময়

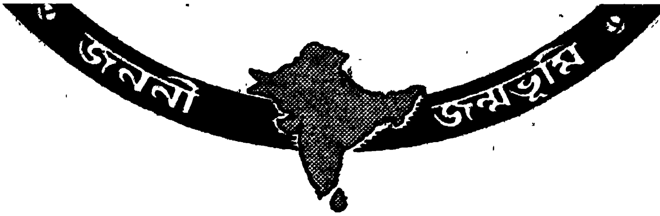


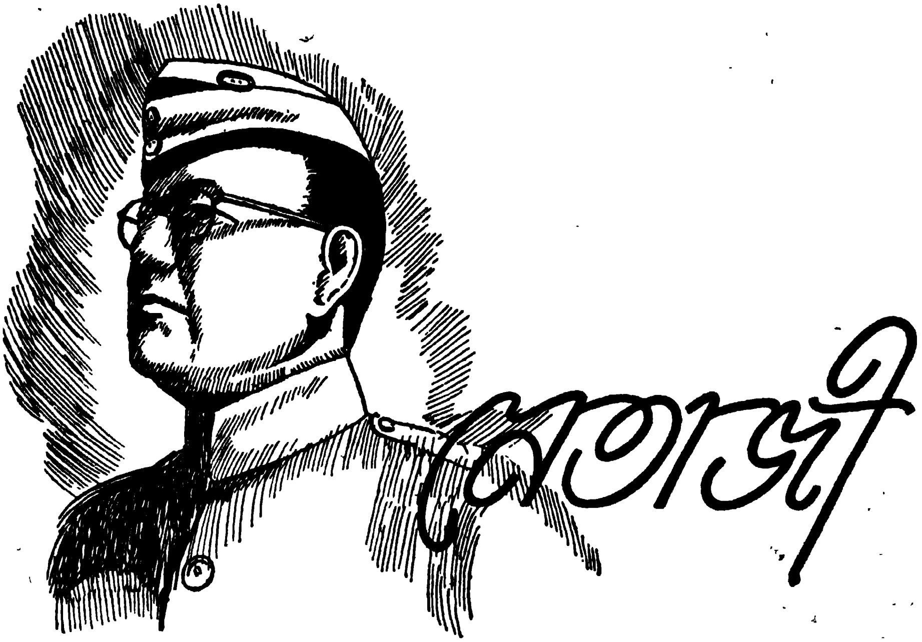
একজন সৈনিক এসে মা'র হাতে বেয়নেটের আঘাত করাতে ইস্তাহারগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। জনতা ভয়ে ছুটে পালাতে লাগলো। বৃদ্ধা উচ্চৈঃস্বরে তাদের ডেকে বলতে লাগলেন, ভয় নেই! ভয় নেই! মানুষের মধ্যে জেগেছে সত্যের দেবতা! কোনো বেয়নেটে তাকে মারা যাবেনা! এমন সময় আর একজন



—ভয় নেই! মানুষের মধ্যে জেগেছে, সত্যের দেবতা?—

সৈনিক এসে মা'র মাথায় আঘাত করলো। মাথা ফেটে ঝর-ঝর ধারায় রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগলো। তারা টানতে-টানতে মাকে নিয়ে চল্লো! একহাত দিয়ে রক্তের ধারা সরিয়ে মা বলে উঠলেন, রক্তের নদী-ও যদি ওরা বইয়ে দেয়, তবু সত্যকে ডোবাতে পারবেনা। প্রভাত-সূর্য্যের মতন এই সত্য একদিন-না-একদিন জেগে উঠবেই! প্রহারে-প্রহারে তাঁর জরাজীর্ণ দেহ জ্ঞানহারা হয়ে পড়লো। তাঁর অস্পষ্ট মনে হলো, কারা যেন তাঁকে ঠেলতে-ঠেলতে একটা ঠাণ্ডা ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলো। কারাগারের লোহার দরজার শব্দ অস্পষ্ট কানে এলো, অস্ফুটকণ্ঠে তাঁর মুখ থেকে শুধু বেরুলো, হায়রে হতভাগ্যের দল।





নেতাজী

এক

বাপের কড়া হুকুম···পাড়ার যা-তা ছেলের সঙ্গে মিশে হৈ-হৈ করতে পারবে না।

সুবির ওপর পিতা জানকীনাথের আদেশ।

সুভাষচন্দ্র···বাড়ীর সকলে আদর করে ডাকে, সুবি।

কিন্তু সুবি সে-আদেশের তাৎপর্য্য বুঝতে পারেনা। পাড়ার সমবয়সী ছেলেদের আর স্কুলের সহপাঠীদের নিয়ে গোপনে সে একটা ক্লাব প্রতিষ্ঠা করে।

বিবেকানন্দের ছোট্ট একখানি ছবি···সেই ছবির সামনে ধূপ-ধুনো জেলে কতকগুলি কিশোর···সেই মহাপুরুষকে তাদের অন্তরের শ্রদ্ধা আপন করে।



সুবি বিবেকানন্দের লেখা থেকে ক্লাবের সভ্যদের পড়িয়ে শোনায়। বিবেকানন্দ বলে গিয়েছেন, ভগবান্—দরিদ্র নিঃস্ব আতুর ব্যাধিগ্রস্ত লোকদের মধ্যে বিরাজ করছেন··· দরিদ্র মানুষের সেবার মধ্যে ভগবান্‌কে সেবা করা হয়। সুবি সে-কথা বিশ্বাস করে। তাই সহপাঠী আর সমবয়সীদের নিয়ে সে ক্লাব করেছে, দরিদ্রদের সেবা করবার জন্যে।

কটকে তখন মড়ক দেখা দিয়েছে। বসন্ত রোগে ঘরে-ঘরে লোক অসহায় ভাবে মারা পড়ছে। তাদের কে সেবা করে, তাদের মুখে কে জল দেয়, এমন লোক নেই।

সুবি তার সঙ্গীদের নিয়ে সেই মড়কের মধ্যে অসহায় মানুষের সেবার কাজে নেমে পড়ে। বাড়ীতে কেউ তার খবর জানেনা।

দুই

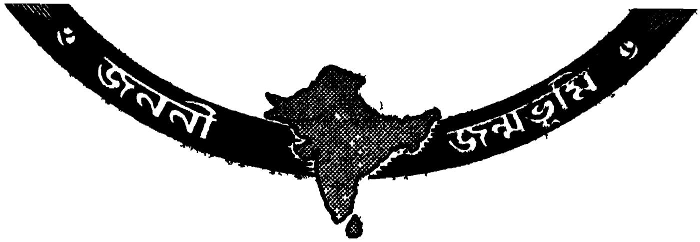
বাড়ীর কর্ত্তার কাছে ক্রমশ খবর পৌঁছতে থাকে, সুবি নাকি ইদানীং দেরী করে বাড়ী ফিরছে!

জননী চিন্তিত হয়ে পড়েন। লক্ষ্য করেন, ছুটির দিন ভোর না হতেই কখন সুবি বেরিয়ে যায়! বাড়ী থেকে তখন কেউ ঘুম থেকে ওঠেনা পর্য্যন্ত! কখন যে বাড়ী ফিরে আসে তার ঠিক নেই।

অবশ্য, বালকের যাওয়া-আসা, খাওয়া-দাওয়া, শোয়া-বসার সঙ্গে তার মা-বাবার ততখানি সম্পর্ক ছিলনা, যতখানি ছিল সেই বাড়ীর এক বৃদ্ধা পরিচারিকার। বহুদিনের পুরণো ঝি, আজ আর ঝি হিসাবে তাকে কেউ দেখে না। বাড়ীরই একজন। সুবিকে আঁতুড়ঘর থেকে সেই কোলে-পিঠে মানুষ করেছে। সুবিকে দেখাশোনা করা, সুবির সব-কিছু নির্ভর করে সেই বৃদ্ধার ওপর। সমস্ত বাড়ীর মধ্যে বৃদ্ধার সঙ্গেই তার সম্পর্ক।

সুবির যা-কিছু ত্রুটী, যা-কিছু অন্যায়, বৃদ্ধা সযতনে বাড়ীর সকলের কাছ থেকে লুকোতে চেষ্টা করে। বৃদ্ধা আদর করে তাকে ডাকে, দেবতা···

তারই পরম গৌরব, বাংলাদেশের মধ্যে সে চিনেছিল তার সুবিকে!



তিন

জননী সেদিন পুত্রের জন্যে অপেক্ষা করে আছেন। আজ তিনি দেখবেন, ছেলে কখন বাড়ীতে ফেরে। ঠিক করে আছেন, রীতিমত ভৎর্সনা করবেন।

দেখেন, সন্ধ্যা পাব হয়ে গিয়েছে···রাত্রিব অন্ধকারে সুবি নিঃশব্দে চোরের মতন বাড়ীতে ঢুকছে। ঢুকেই সোজা বৃদ্ধার ঘরে ঢুকে পড়লো। বৃদ্ধার ঘরে আলো জ্বলে উঠলো।

জননী নিঃশব্দে দবজার কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখেন, প্রদীপের সামনে বৃদ্ধা সযত্নে বালকের পায়ের ক্ষত ধুইয়ে দিচ্ছে। এতখানি যে ক্ষত হয়েছে, জননী তার বিন্দু-বিসর্গও জানেননা।

বৃদ্ধা সভয়ে বলে, দেখো ত' দেবতা, কি করেছ ? মা দেখলে কি রক্ষে রাখবেন ?

জননী ঘবে ঢুকে পড়েন। ভক্ত ও দেবতা, দুজনেই ভয়ে সচকিত হয়ে ওঠে। সদ্য-সদ্য আজ তাবা ধবা পড়ে গিয়েছে।

জননী সুবিকে তীব্রভাবে ভৎর্সনা করেন।

বালক শুধু গম্ভীর হয়ে বসে থাকে। বেশী কথা সে বলেনা। জননী বারবার প্রশ্ন করেও তার গতিবিধি সম্পর্কে কোন উত্তরই জানতে পারেননা।

পিতাকে গিয়ে জানান।

চার

ভোব না হতেই আজ পিতা বাইরে এসে দাঁড়িয়ে আছেন। যে মুহূর্তে সুবি লুকিয়ে পালাতে চেষ্টা করবে, ধরবেন।

ঠিক ভোর না হতেই, লোকজন বিছানা থেকে উঠতে-না-উঠতেই সুবি সন্তর্পণে দরজার দিকে এগিয়ে চলে। হঠাৎ সামনে দেখে, গম্ভীর-মূর্ত্তি পিতা দাঁড়িয়ে।

বাধ্য হয়েই সুবি দাঁড়িয়ে পড়ে।



—রোজ ভোর না হতেই কোথায় যাও ?

গম্ভীরভাবে বালক জবাব দেয়, রুগীর সেবা করতে।

পিতা অবাক হয়ে যান।

—রুগীর সেবা ! মানে ? কার অসুখ করেছে ?

বালক স্থিরকণ্ঠে জানায়, অসুখ তো একজনের নয়···শহর সুদ্ধ লোকের যে বসন্ত হচ্ছে···ঘর-ঘর যে লোক মরে যাচ্ছে !

পিতা কল্পনাও করেননি যে, তাঁর বালক-পুত্র সেই ভয়াবহ মড়কের মধ্যে মারাত্মক রোগের সংস্পর্শে রুগীদের বাড়ীতে-বাড়ীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে !

ক্রুদ্ধকণ্ঠে পিতা বলেন, শহরে মড়ক হচ্ছে, তাতে তুমি কি করবে ? জানোনা, বসন্ত কতখানি মারাত্মক ছোঁয়াচে রোগ ?

—জানি। আমরা খুব সাবধানে কাজ করি এবং তার জন্যে রীতিমত ট্রেণিং নিয়েছি !

—কিন্তু দুদিন বাদে যে তোমার পরীক্ষা, সে হুঁস আছে ? পরীক্ষা না হওয়া পর্য্যন্ত তুমি বাড়ী থেকে আর বেরুতে পারবেনা। যাও !

মুখ ভার করে অভিমানী বালক তৎক্ষণাৎ ঘরে ফিরে যায়।

বুদ্ধাকে ডেকে বলে, আমি আর এ-ঘর থেকে বেরুবোনা, আমার খাবার এই ঘরেই দিয়ে যাবে।

অভিমানী বালক সেইদিন থেকে সেই ঘরের মধ্যে নিজেকে স্বেচ্ছায় বন্দী করে পড়তে আরম্ভ করে।

পরীক্ষার ফল যখন বেরুলো, তখন দেখা গেল, বালক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে···প্রথম ছাত্রের চেয়ে মাত্র সাত নম্বরের কম···৭০০-এর মধ্যে ৬০৯···



পাঁচ

কটক থেকে কলকাতা। কলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজ।

কলেজে এসে নতুন সব বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ হয়।

মিরজাপুর ষ্ট্রীটের এক মেসে তাদের আড্ডা জমে। কতকগুলি তরুণ প্রাণ। তাদের আদর্শ এক, ভাবনা এক, লক্ষ্য এক।

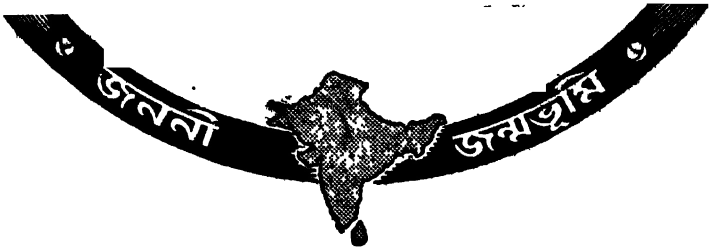
তাদের সকলের চোখের সামনে রয়েছে, বীর-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের আদর্শ। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ। অরবিন্দের সাধনা।

তরুণেরা সঙ্কল্প করে, আজীবন ব্রহ্মচর্য্য সাধনার দ্বারা তারা নিজেদের তৈরী করবে—দেশের জন্যে, মানুষের সেবার জন্যে।

তরুণ সুভাষ মনে-মনে বিবেকানন্দকে গুরু বলে বরণ করে নেন্···তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে তিনি সুপবিত্র নিষ্কলুষ জীবন গড়ে তুলবেন···সে-জীবন তিনি মানুষের সেবায়, দেশের সেবায় উৎসর্গ করবেন।

তাঁরা দল বেঁধে বাংলাদেশ দেখতে বেরিয়ে পড়েন—তীর্থযাত্রীরা যেমন তীর্থদেবতার সন্ধানে বেরোয়। অতীত বাংলার গৌরব এখনো তার ভগ্ন মন্দিরে, জীর্ণ দুর্গে, পরিত্যক্ত নগরে-নগরে পড়ে রয়েছে। সেখানে গিয়ে তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে সেখানকার ধূলোমাটি জল-হাওয়ার ভেতর থেকে সেই অতীত গৌরবের স্পর্শ নিজেদের অন্তরে নেবেন। যে-বাংলাকে তাঁরা ভালবাসেন, প্রত্যক্ষভাবে তাকে দেখবেন, চিনবেন।

কলকাতা থেকে কৃষ্ণনগর, কৃষ্ণনগর থেকে পলাশী। এই পলাশীর মাঠে ভারতের সূর্য্য গিয়েছে অস্ত।



ছয়

পলাশীর মাঠ ধূ-ধূ পড়ে আছে···নেই আর সেই আম-বাগান, যার আড়ালে লুকিয়ে ছিল ক্লাইভ তার মুষ্টিমেয় সৈন্যদের নিয়ে···

শুধু এক জায়গায় বিজয়ী ইংরেজ একটা পাথরের ফলকে পলাশীর স্মৃতি বাঁধিয়ে রেখেছে···

তরুণ সুভাষচন্দ্র সেই স্মৃতিস্তম্ভের সামনে গিয়ে দাঁড়ান।

দলের মধ্যে থেকে কে-একজন আবৃত্তি করে ওঠে, কবি নবীন সেনের লেখা থেকে মৃত্যুপথযাত্রী আহত মোহনলালের শেষ আক্ষেপ।

তরুণ সুভাষের চোখ অশ্রু-সজল হয়ে ওঠে।

কে-একজন বন্ধু পাথরের গায়ে ইঁটের কুঁচি দিয়ে লিখে দেন, "জ্বলন্ত বিশ্বাস-ঘাতকতার স্মৃতি-চিহ্ন।"

সেখান থেকে তাঁরা ঘুরে বেড়ান মুর্শিদাবাদের তীর্থে-তীর্থে···হাজার-দুয়ারি, মতিঝিল, সিরাজের কবর, রাণী ভবানীর মন্দির···

গঙ্গায় রাত্রিতে নিস্তরঙ্গ জলে জ্যোৎস্না এসে পড়ে।

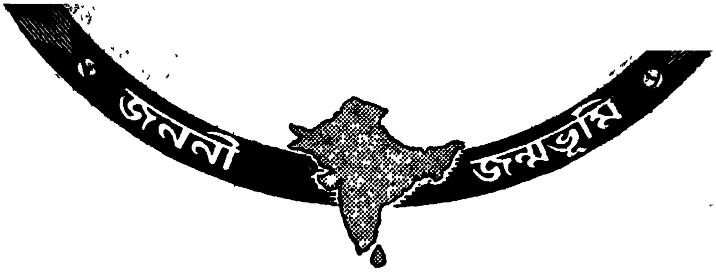
সুভাষচন্দ্রের মন অতীত বাংলার গৌরবে গঙ্গার মত টলটল করে ওঠে।

গান গেয়ে ওঠেন, "হের দূরে চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিতা গঙ্গা!"

সাত

বাংলার গৌরবের শত-স্মৃতি বুকে নিয়ে সুভাষচন্দ্র ফিরে আসেন। মনে-মনে সঙ্কল্প করেন, সে গৌরব ফিরিয়ে আনবার জন্যে এ জীবন উৎসর্গ করবেন!

তার জন্যে নিজেকে তৈরী করতে হবে। বুঝেছিলেন, যে-পথে যেতে হবে সে-পথে ছায়া নেই, জল নেই, আশ্রয় নেই। তাই কঠোর সাধনায় নিজেকে গড়ে তুলতে হবে।



কোন কষ্ট, কোন দুঃখ, কোন বেদনা, কোন লোভ যেন জীবনকে বিচলিত না করতে পারে। সন্ন্যাসীর মতন নিজেকে গড়ে তুলতে হবে।

সেই সাধনার জন্যে সুভাষচন্দ্র শান্তিপুরে আসেন।

শান্তিপুরে গঙ্গার ধারে একটা পোড়ো বাড়ী। সেই বাড়ীতে তাঁরা আশ্রয় নেন। সকলে গেরুয়া ধারণ করলেন। কঠোরভাবে সাধনায় দিনযাপন করতে লাগলেন। নিজেরা ভিক্ষা করে যা সংগ্রহ করে আনেন, নিজেরা রেঁধে তাই খান। আবক্ষ গঙ্গাজলে নেমে ধ্যান করেন।

গঙ্গাস্নান করতে এসে বৃদ্ধারা সেই গেরুয়াধারী তরুণ মূর্ত্তির দিকে চেয়ে বলে ওঠে, আহা, কাদের ছেলে রে! যেন নিমাই নতুন করে নদেতে এসেছে!

নীরবে গোপনে চলতে থাকে সন্ন্যাসের সাধনা।

আট

কিন্তু, গুরু না হলে এ-পথে সিদ্ধি কি করে পাওয়া যাবে?

উপযুক্ত গুরু দরকার।

কিন্তু কোথায় সেই গুরুর সন্ধান পাওয়া যায়?

তরুণ সুভাষ তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করেন। পরামর্শ করে ঠিক হয় যে, তাঁরা দুজনে উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে বেরিয়ে পড়বেন!

বাড়ীতে কাউকে কিছু না বলে সুভাষচন্দ্র একদিন গুরুর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন।

বাড়ীর লোকেরা কেউ কোন সন্ধানই পেলেননা।

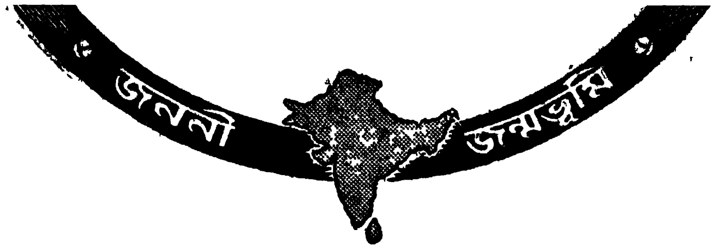
ভারতের তীর্থে-তীর্থে, মন্দিরে-মন্দিরে ঘুরে বেড়ান, গুরুর সন্ধানে!

কোথায় সে গুরু, যিনি জীবনের পরম সিদ্ধির পথ দেখিয়ে দেবেন?

বহু লোকের সঙ্গে দেখা করেন, বহু সন্ন্যাসীর সঙ্গে, কিন্তু কাউকেই গুরু বলে স্বীকার করতে মন চায়না।

অবশেষে হতাশ হয়ে আবার বাড়ীতে ফিরে এলেন।

কলেজের পড়া যেমন চলছিল, তেমনি চলতে থাকে।



নয়

হঠাৎ কলেজে হলো মহাগণ্ডগোল।

কলেজের ইংরেজ-অধ্যাপক ওটেন সাহেব বাঙালী-ছাত্রদের অপমান করেন।

ছেলেরা তার প্রতিবাদ করে। সুভাষচন্দ্র প্রতিবাদকারীদের নায়ক হন।

ওটেন সাহেবের ক্লাস থেকে তারা বেরিয়ে আসে। ধর্ম্মঘট করে।

সাহেব রাগ করে তাদের ফাইন করেন। ফাইন দিতে ছাত্ররা অস্বীকার করলো।

ওটেন সাহেব তাতে আরো চটে গেলেন, রেগে বলে উঠলেন, "Don't chatter like monkies"…

তার পরের দিন ওটেন সাহেব সিঁড়ি দিয়ে যখন নামছিলেন, তখন শাদা-বিছানার চাদরে মুখ ঢেকে দু'জন ছেলে পেছন দিক থেকে তাঁকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলো…অমনি আরো কয়েকটি ছেলে এসে রীতিমত প্রহার করলো…

কলেজের প্রিন্সিপ্যাল বিচার-সভা বসালেন। বিচারে সুভাষচন্দ্র এই ঘটনার প্রধান-রূপে দণ্ডিত হলেন। রেগে প্রিন্সিপ্যাল বললেন, সমস্ত ছেলেদের মধ্যে তুমিই সবচেয়ে বদমাইস! আজ থেকে তুমি বিতাড়িত হলে!

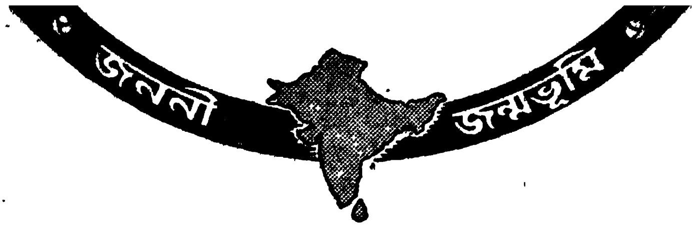
সেই তিরস্কারকে নিজের পুরস্কার মনে করে সুভাষচন্দ্র কলেজ ত্যাগ করলেন।

দশ

বছরখানেক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হয়ে থাকবার পর তিনি আবার কলেজে ঢোকবার অনুমতি পেলেন।

স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের অধ্যক্ষ আর্কুহার্ট সাহেব আদর করে তাঁকে তাঁর কলেজে ডেকে নিলেন।

সেই সময় বাঙালী-ছেলেদের সামরিক শিক্ষা দেবার জন্যে ছাত্রদের একটা পল্টন গঠিত হয়। সুভাষচন্দ্র তাতে যোগদান করলেন।



সর্ব্ব মনপ্রাণ দিয়ে তিনি সেই নতুন বিদ্যা শিক্ষা করতে লাগলেন। যে-পথে তাঁকে যেতে হবে, তাতে এ-বিদ্যার বিশেষ প্রয়োজন।

কোহিমার রণক্ষেত্র তখন বহু, বহু দূরে অস্পষ্ট নীহারিকার মধ্যে পড়েছিল।

এগার

কলেজের সেরা ছাত্র···দর্শনে অনার্স নিয়ে গৌরবে পাশ করলেন।

পিতার ইচ্ছা অনুযায়ী বিলাতে এলেন আই. সি. এস. পড়তে।

আই. সি. এস্. পাশ করা মানে, ম্যাজিষ্ট্রেট হওয়া। যাদের সাহায্যে ইংরেজরা এই দেশকে পরাধীন করে রেখেছে, তাদেরই একজন হওয়া!

তরুণের আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ! তাই তরুণকে যাঁরা চিনতেন, তাঁরা অবাক হয়ে যান। বিলাতে বন্ধু দিলীপকুমারের সঙ্গে একদিন তাই নিয়ে আলোচনা হলো।

বন্ধু দিলীপকুমার বলেন, "কি ব্যাপার? তুমি আই. সি এস্ পড়ে শেষকালে কি, জবরদস্ত ম্যাজিষ্ট্রেট হবে?"

—মোটেই না!

—তবে?

—এই ট্রেণিংটা ইংলণ্ডের সেরা ট্রেণিং। সেটা নিয়ে রাখতে আপত্তি কি?

—কিন্তু, তারপর?

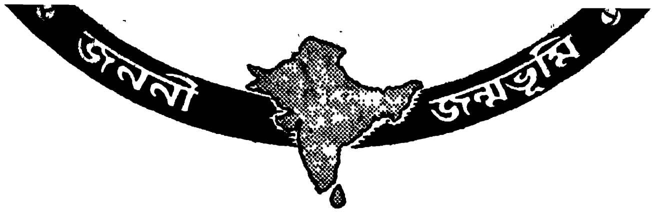
—চাকরি করা, বা, না-করা, সে তো আমার হাতে!

সুভাষচন্দ্র সগৌরবে পাশ করলেন···কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে এই কৃতিত্বের যা পুরস্কার, তা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করলেন! তিনি ইংরেজদের দেওয়া কোন চাকরি নেবেন না।

বিলাত থেকে সোজা তাই এসে নামলেন, সবরমতীতে, মহাত্মা গান্ধীর কাছে!

—আমি প্রস্তুত···দেশের কাজে আপনার শিষ্য হতে চাই, সহায় হতে চাই!

মহাত্মা গান্ধী আনন্দিত চিত্তে তাঁকে দেশবন্ধুর কাছে পাঠিয়ে দেন।



কলকাতায় নেমে তিনি প্রথমে দেশবন্ধুর সঙ্গে দেখা করলেন।

এতদিন পরে গুরুর সন্ধান পেলেন।

বার

দেশবন্ধুর কাছে দীক্ষা নেবার পরে অনেকগুলি শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-বসন্ত কেটে গেছে!

দুরন্ত কৃতান্তের বহু আহ্বান-আমন্ত্রণ উপেক্ষা করে, অসুর-নিধন যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দেবার জন্যে লৌহ-ভীম সদৃশ সুভাষচন্দ্র এগিয়ে চলেছেন একেবারে মহাপ্রলয়ের মাঝখানে।

সে আর-এক দিনের কথা।

মাইনে-ভরা য়ুরোপ থেকে এশিয়ায় আসবার সমুদ্র-পথ।

সমুদ্রের তরঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রহরী রণ-তরী, শত্রুর জাহাজের সন্ধানে।

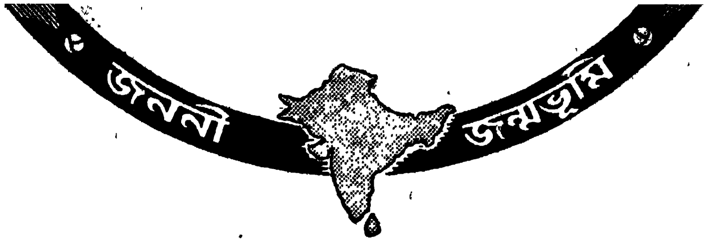
সমুদ্রের তরঙ্গের ওপরে আকাশে বাজবাখীর মতন ঘুরে বেড়াচ্ছে এরোপ্লেন, নীচে সমুদ্রের দিকে বদ্ধ-দৃষ্টি, যদি কোন শত্রুর জাহাজ চোখে পড়ে তৎক্ষণাৎ তার ওপর করবে মৃত্যু বর্ষণ।

ঘোরালো হয়ে উঠেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ।

মৃত্যুর হাত এড়িয়ে, যমদূতের মতন শত্রুপক্ষের সশস্ত্র প্রহরীদের দৃষ্টি এড়িয়ে, বৃটীশের চিরশত্রু চির-দুর্বিনীত বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র কলকাতা থেকে এসেছেন বার্লিনে, বৃটীশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শত্রুর রাজধানীতে!

অহিংস কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি আজ মরণ-পণ করেছেন, ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ভারতবর্ষকে অস্ত্রবলে জয় করে নেবেন। ভারতবর্ষের সমস্ত সুপ্ত সামরিক শৌর্য্য জেগে উঠেছে এই বাঙালী বিপ্লবীর মধ্যে।

যেদিন এই সঙ্কল্প করে প্রহরী-বেষ্টিত বন্দী-দশা থেকে তিনি সকলের চোখে ধূলো দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন, সেদিন তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ একা, একক। হাতে একটা অস্ত্র পর্য্যন্ত নেই, সঙ্গে একটিও সৈন্য নেই। অস্ত্র, বা সৈন্য কোথায় পাওয়া



যাবে, তার আশা পর্য্যন্ত নেই। অথচ সেই অবস্থায় দুরন্ত বিপ্লবী বেরিয়ে পড়লেন বিশ্বের পথে, অন্তরে নিয়ে সেই অসম্ভব দুরাকাঙ্ক্ষা।

সাহারা মরুভূমির ভেতর যানবাহনহীন অবস্থায় পথিক নগ্নপদে একা বেরিয়েছেন পথের সন্ধানে; এবং সেই মরুভূমির ভেতর থেকে পায়ে হেঁটে তিনি পথ বার করলেন···দুস্তর মরুভূমি বার হলেন।

প্রণাম হে দুর্জয় বিপ্লবী! তোমার মতন লোক অসম্ভবকে সম্ভব করবার দৈবী শক্তি নিয়ে এসেছিল বলেই আজ পৃথিবী এত সুবিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী।

ভের

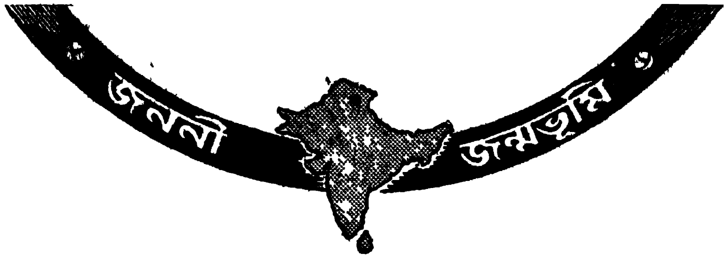
প্রথম যৌবনে যখন কলেজে পড়েন, তখন রীতিমতভাবে নিয়েছিলেন সামরিক শিক্ষা। সামরিক-কায়দায় গড়ে তুলেছিলেন কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। সেনাপতির পোষাকে পরিচালনা করেছিলেন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে। সেদিন অস্ত্রহীন সেই সেনাপতির সজ্জা দেখে লোকে করেছিল উপহাস, ঠাট্টা করে বলেছিল, 'গক্' (G.O.C.)!

কিন্তু নীরবে সুভাষচন্দ্র সহ্য করেছিলেন সে উপহাসকে।

তাই বার্লিনের সেই সামরিক-আবহাওয়ায়, জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রণপণ্ডিত সেনা-নায়কদের সামনে এই বাঙালী বিপ্লবী মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পেরেছিলেন। এবং প্রবাসী ভারতবাসীদের নিয়ে তিনি গঠন করলেন এক সামরিক বাহিনী। নিষ্ঠা-সহকারে তিনি জার্ম্মানীর আধুনিকতম সমর-বিদ্যা অনুশীলন করলেন।

কিন্তু সেই মুষ্টিমেয় প্রবাসী-ভারতবাসীদের নিয়ে তিনি কি করে এই বিরাট অভিযানে নামবেন?

তাঁর দৃষ্টি গিয়ে পড়লো, সমুদ্রের ওপারে, সিঙ্গাপুরে। সেখানে আর-একজন বাঙালী-বিপ্লবী স্বদেশ থেকে নির্ব্বাসিত হয়ে এই মুহূর্ত্তের অপেক্ষায়ই জেগে ছিলেন। তাঁর নাম, রাসবিহারী বসু।



নিজের প্রতিভায় তিনি জাপানের অভিজাত-সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর স্থান করে নিয়েছিলেন। জাপানের প্রধান রাজনৈতিকদের সঙ্গে তিনি একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও গড়ে তুলেছিলেন। শক্তিশালী জাপানের সাহায্যে তিনি গঠন করেছিলেন এক নতুন বাহিনী! এই বাহিনীতে তিনি সৌভাগ্যক্রমে একজন ভারতীয় সেনা-নায়কের সহযোগিতাও পেলেন, তিনি জেনারেল মোহন সিংহ। যেসব ভারতীয়-সৈন্য জাপানের হাতে বন্দী হয়েছিল, মোহন সিং তাদেরই একজন। তিনি তাঁর ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে রাসবিহারী বসুর সঙ্গে যোগদান করলেন।

কিন্তু উপযুক্ত নায়কের অভাবে তাঁদের সমস্ত আয়োজন সত্ত্বেও তাঁরা বিশেষ অগ্রসর হতে পারছিলেননা। জাপানী-সেনাপতিদের হুকুমে তাঁদেব উঠতে-বসতে হতো। তার ফলে তাঁদের দলের মধ্যেও গোলযোগ উপস্থিত হলো।

এমন সময় রাসবিহারী সংবাদ পেলেন, বার্লিনে সুভাষচন্দ্রের। তিনি সিঙ্গাপুরে আসবার জন্য তাঁকে আহ্বান করলেন। সুভাষচন্দ্রও এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন।

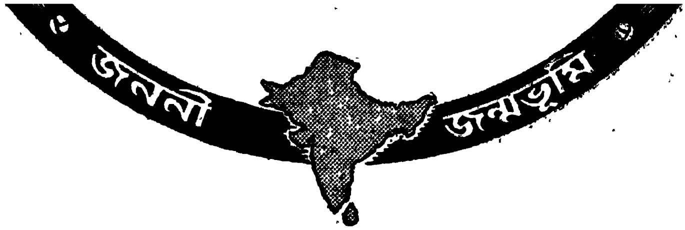
অন্তর থেকে যে চায় পথ চলতে, তার সামনে অরণ্যের ভেতর থেকে জেগে ওঠে পথ।

চৌদ্দ

বার্লিন থেকে সুভাষচন্দ্র সঙ্কল্প করলেন, সিঙ্গাপুরে যাবেন। জানালেন, তাঁর জার্ম্মানবন্ধুদের। জাপান তখন জার্ম্মানীর বন্ধু। সুতরাং সিঙ্গাপুরে যাওয়া সম্পর্কে জার্ম্মানীর আপত্তি হলো না। কিন্তু কথা হলো, যাবেন কি করে? বৃটীশের সদাজাগ্রত প্রহরীদের বেড়া ডিঙ্গিয়ে মাইনে-ভরা সাগর পেরিয়ে সিঙ্গাপুরে যাওয়া মানে, মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়া।

কিন্তু বিপ্লবীর কাছে মৃত্যু-ভয়ের কোন অর্থই নেই।

সুভাষচন্দ্র সেই চরম দুঃসাহসিক অভিযানে প্রস্তুত হলেন। এক জার্ম্মান-সাবমেরিণে তিনি যাত্রা করলেন সিঙ্গাপুরের দিকে।



তারপর মৃত্যুকে এড়িয়ে যেদিন তিনি সিঙ্গাপুরে উপস্থিত হলেন, ভারত-দ্বীপপুঞ্জের সমস্ত প্রবাসী-ভারতবাসীর জীবনে অকস্মাৎ এক মহা-জাগরণের তরঙ্গ নেচে উঠলো ! অপার বিস্ময়ে আর শ্রদ্ধায় সেই মৃত্যুঞ্জয়ী বিপ্লবীর পতাকার তলায় তারা সমবেত হলো ।

শুধু একটিমাত্র মানুষের ব্যক্তিত্ব আর চরিত্র, কি অঘটন ঘটাতে পারে, সেদিন প্রত্যক্ষভাবে আর-একবার তার পরীক্ষা হয়ে গেল সেই দক্ষিণ-এশিয়ার সমুদ্র উপকূলবর্ত্তী দেশে ।

কে যেন যাতুকরের মতন একটুখানি ছোঁয়ায় ঘুমন্ত রাজপুরীকে জাগিয়ে তুললো ! কাল যা মনে হয়েছে অসম্ভব, আজ সহসা তাই মনে হলো একান্ত সহজসাধ্য ! এতদিন পর্য্যন্ত ভেতরে-ভেতরে চলছিল যে দলাদলি, ছিল যে সংশয় ভয় আর তুর্ভাবনা, সুভাষচন্দ্রের একটি কথায় যেন তা অদৃশ্য হয়ে গেল !

সুভাষচন্দ্রের আহ্বানে সেদিন দক্ষিণ-এশিয়ার প্রত্যেক ভারতবাসী অন্তর থেকে সাড়া দিয়ে উঠলো । বৃদ্ধ, যুবা, বালক, বালিকা, ধনী, নির্ধন, শ্রমিক, চাষী, লক্ষপতি—সকলে এলো ছুটে । সকলের সঙ্গে ছুটে এলো ভারত-নারী । সুভাষচন্দ্রের দিকে চেয়ে তারা সকলে দেখতে পেলো তাদের দেশজননীর দিব্য-মূর্ত্তি ।

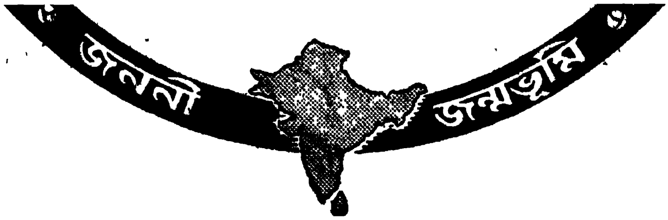
সুভাষচন্দ্র তাদের কোন মিথ্যা আশ্বাস দিলেননা, কোন স্তোকবাক্য শোনালেননা, অতি স্পষ্টভাবে তাঁর প্রাণের অগ্নিজ্বালা তাদের সামনে উপস্থিত করলেন এবং তাঁর অগ্নিবাণীতে প্রত্যেকের অন্তরে জ্বলে উঠলো আগুন !

তিনি তাঁদের সকলকে ডেকে শুধু বললেন একটি কথা : আমি এসেছি কোন ঐশ্বর্য্যের আশা নিয়ে নয়, কোন আরামের স্বপ্ন নিয়ে নয় । আমি আপনাদের কাছে চাইতে এসেছি একটিমাত্র জিনিস, মৃত্যু···তার বদলে, আমি দেবো স্বাধীনতা !

এমনভাবে আর কেউ তাদের আহ্বান করেনি !

তারা উন্মাদ হয়ে উঠলো, সেই মৃত্যু-মূল্যেই স্বাধীনতা কিনতে ।

সুভাষচন্দ্র বললেন, যতদিন না স্বাধীন-ভারতের মাটিতে গিয়ে আমরা স্বাধীন-ভারতের পতাকা তুলছি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের জীবনে আর কোন চিন্তা নেই, আর কোন কাজ



নেই। এবং এই আশা সফল করতে হলে, আমাদের যা-কিছু আছে, সবই আজ বিসর্জ্জন দিতে হবে। সর্ব্বস্ব না দিলে, পাওয়া যায় না স্বাধীনতা।

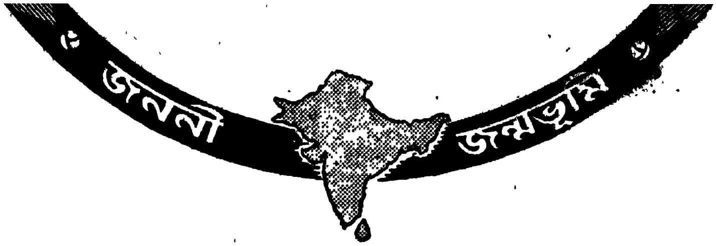
সেই যাদুকরের আহ্বানে প্রবাসী-ভারতবাসীরা তাদের সর্ব্বস্ব নিয়েই ছুটে এলো। কেউ দ্বিধা করলোনা, কেউ অগ্রপশ্চাৎ ভাবলোনা, কেউ তর্ক করলোনা ; যার যা-কিছু ছিল সব নিয়ে উপস্থিত করলো তাদের নেতাজীর সামনে।

লক্ষপতি স্বেচ্ছায় খুলে দিলো তার গোপন-সিন্দুকের ডালা! গৃহস্থ নিয়ে এলো তার সারাজীবনের সঞ্চয়! নারীরা অঙ্গ থেকে এক-একটি করে খুলে দিলো স্বর্ণ-অলঙ্কার! আজ এসেছে, নিঃস্ব হয়ে বিলিয়ে দিয়ে, ধনী হবার মহালগ্ন!



—মাগো, তোমার এই পয়সা কয়টিই সবচেয়ে বড় দান!—

সেই অগণন জনতার ভেতর থেকে কাঁপতে-কাঁপতে নেতাজীর দিকে এগিয়ে আসে জরাজীর্ণ এক বৃদ্ধা। সে তার সারাজীবনের ভিক্ষা-লব্ধ সঞ্চয়, এক থলি



পয়সা ে সামনে ধরে। বলে, দেবতা, নেবে কি আমার এই সামান্য দান ?

. নেতাজীর দুই চোখে জল গড়িয়ে পড়ে। বলে, মাগো, তোমার এই পয়সাকটিই সবচেয়ে বড় দান !

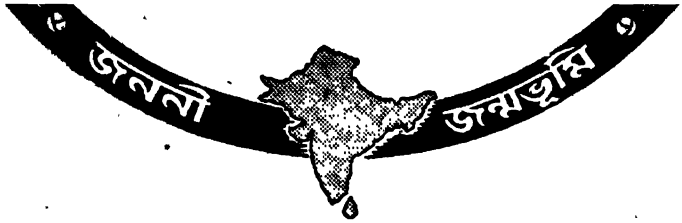
সভার শেষে নেতাজীর গলার মালা নীলামে ওঠে। একটা ফুলের মালার দাম হয়, এক লক্ষ টাকা !

পনেরো

এইভাবে অর্থ আর লোক একত্রিত করে নেতাজী গঠন করেন, 'আজাদ-হিন্দ-গভর্ণমেন্ট'—স্বাধীন ভারত-সরকার। গড়ে তোলেন তার স্বতন্ত্র মন্ত্রিসভা, তার স্বতন্ত্র ব্যাঙ্ক, তার স্বতন্ত্র সেনা-বাহিনী। একটা রাষ্ট্রের যা-কিছু প্রয়োজন, তন্ন-তন্ন করে গড়ে তোলেন তার প্রত্যেকটি বিভাগ। সেই অল্প সময়ের মধ্যে, সেই যুদ্ধের অনিশ্চয়তার মধ্যে, নিখুঁতভাবে গড়ে তুললেন একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র এবং ঘড়ির কাঁটার মতন নিখুঁতভাবে তা চলতে থাকে। জাপানীরা অবাক হয়ে যায় সেই গঠন-প্রতিভা দেখে ! সেই বিশাল ব্যক্তিত্বের সামনে আপনা থেকে সঙ্কুচিত হয়ে যায় বলদীপ্ত জাপানী সামরিক-নেতারা।

জাপান-গভর্ণমেন্টের সাহায্য নেতাজী নিলেন ; কিন্তু গোড়াতেই একটা কথা অতি স্পষ্টভাবে তাদের সঙ্গে মীমাংসা করে নিলেন—আজাদ-হিন্দ-সরকার জাপানের কোন তাঁবেদার আজ্ঞাপালনকারী রাষ্ট্র নয়, জাপানের মতনই মর্য্যাদা তাকে দিতে হবে এবং আজাদ-হিন্দের কর্ম্মচারীদের সহযোগী স্বাধীন রাষ্ট্রের কর্ম্মচারীদের মতনই সম্মান দিতে হবে।

মনে রাখতে হবে, তখন জাপান জগতের একটা শ্রেষ্ঠ সামরিক-শক্তি। তার ওপর, একটার পর একটা সামরিক জয়ে তার প্রতিষ্ঠা আর অহমিকা তখন মেঘেতে গিয়ে ঠেকেছে। সেই অবস্থাতেই নেতাজী তাদের কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছিলেন, স্বাধীন-সেনাপতির পূর্ণ মর্য্যাদা এবং তাঁর প্রত্যেকটি সৈন্যকে সে-কথা



জানিয়ে বলে দিয়েছিলেন, তারা যেন ভুলেও না মনে করে যে, তারা জাপানের হুমকি মেনে চলতে বাধ্য। যদি কোন উদ্ধত জাপানী-সৈনিক, বা, সেনা-নায়ক আজাদ-হিন্দের কোন লোকের সঙ্গে অমর্য্যাদাকর ব্যবহার করে, তাহলে তৎক্ষণাৎ আজাদ্-হিন্দের লোক তলোয়ার দিয়ে যেন তার যোগ্য প্রত্যুত্তর দেয়।

এইখানেই নেতাজীর কৃতিত্বের অসাধারণত্ব।

একবার একজন বড় জাপানী-সেনাপতি নিজের পদ-মর্য্যাদার গর্ব্বে আজাদ-হিন্দের প্রেসিডেণ্ট নেতাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। কিন্তু তিনি সঙ্গে কোন পরিচয়-পত্র আনেননি। সুভাষচন্দ্র তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন না এবং রক্ষী-মারফৎ তাঁকে জানিয়ে দিলেন, প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে দেখা করতে হলে যে আনুষ্ঠানিক প্রণালী আছে, সেই প্রণালীর ভেতর দিয়েই তাঁকে আসতে হবে। বাধ্য হয়ে সেই সেনাপতিকে সেই প্রণালী-মাফিক পরে আসতে হলো।

ষোলো

বর্ম্মার ঘন পার্ব্বত্য-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে আজাদ-হিন্দ-বাহিনী তার জন্মভূমির দিকে।

তাদের নেতাজী তাদের হাতে দিয়েছেন, স্বাধীন-ভারতের পতাকা, তাদের মুখে দিয়েছেন স্বাধীন-ভারতের জয়-বাণী, 'জয় হিন্দ!' হিন্দু-মুসলমান শিখ-পাঠান ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম অন্তর থেকে ভুলে গিয়েছে তাদের সাম্প্রদায়িক ভেদের কথা। নেতাজীর পতাকার তলায় আজ তারা সবাই ভারতবাসী!

বর্ম্মার ঘন-অরণ্য অনুরণিত হয়ে ওঠে তাদের রণ-হুঙ্কারে, "দিল্লী চলো!"

জীবিত বা মৃত, দিল্লী পৌঁছুতেই হবে।

তাদের সেনাপতি, তাদের নেতাজীও এসেছেন তাদের সঙ্গে।

তাঁর অনুচরেরা তাঁকে নিষেধ করে, বাধা দেয়, বিপদের মুখে এমনিভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে। কিন্তু তাতে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। আজাদ-হিন্দ-বাহিনীতে সকলেই সমান। মরবার অধিকার সকলেরই সমান!



ক্রমশ খাদ্য ফুরিয়ে আসে। পোড়া পাঁউরুটি, দু-টুকরো করে, প্রত্যেক সৈনিকের দিনের বরাদ্দ খাদ্য।

সেনাপতি যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যাবার সময় দেখেন, তাঁর ব্যাগে শাদা রুটি, এবং পূরো একখানা রুটি।

তৎক্ষণাৎ তিনি ডেকে পাঠান, যে-কর্ম্মচারীর ওপর খাদ্যের ভার ছিল। ক্রুদ্ধকণ্ঠে তিনি কৈফিয়ৎ দাবী করেন, কেন তাঁকে এ-রকম আলাদা ভাবে দেখা হয়েছে?

সেই দু-টুকরো পোড়া রুটি নিয়ে তিনি রণ-ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হন।

সেই দু-টুকরো পোড়া রুটি প্রত্যেক সৈনিকের সঙ্গে তাদের সেনাপতির অন্তরকে বেঁধে দেয় এক অপরূপ আত্মীয়তায়!

সতেরো

ভারতবর্ষ আর বর্ম্মার সীমান্ত-দেশ।

অরণ্যের ভেতর চলেছে তুমুল সংগ্রাম। এক বিশ্বাসঘাতক—আজাদ-হিন্দ-বাহিনী পরিত্যাগ করে, বৃটীশের হাতে ধরা পড়েছে। বলে দিয়েছে, কোথায় আছে অরণ্যের ভেতর তাদের নেতাজীর তাঁবু।

আকাশ-পথে বৃটীশ আর আমেরিকান বিমান-বহর খুঁজে বেড়ায় অরণ্যের ভেতর সেই তাঁবু।

এই দুরন্ত বিপ্লবীকে বধ না করতে পারলে, তাদের শান্তি নেই।

আকাশ থেকে মুহুর্মুহুঃ বর্ষণ হতে থাকে শত্রুর গোলা। আহতদের শিবিরের ওপরও চলে বর্ষণ।

নেতাজী নিজে দাঁড়িয়ে আহতদের স্থানান্তরের ব্যবস্থা করেন। চারিদিকে বোমা ফেটে পড়তে থাকে।

নেতাজীর সহচরেরা শঙ্কিত হয়ে ওঠে। যে-কোন মুহূর্ত্তে তিনি বোমার দ্বারা নিহত হয়ে পড়তে পারেন।



কিন্তু নেতাজী তাদের কাতর অনুরোধে জানান, তাঁর আহত সৈন্যদের শত্রুর বোমার মুখে ফেলে দিয়ে তিনি ট্রেঞ্চে নিজে নিরাপদ হয়ে লুকিয়ে থাকতে চাননা।

ধীর স্থির ভাবে তিনি একে-একে আহতদের স্থানান্তরিত করেন। আহত সৈন্যরা তাঁর সেই স্থির মূর্ত্তির দিকে চেয়ে মনে করে, স্বর্গ থেকে দেবতা এসে দাঁড়িয়েছে তাদের রক্ষার জন্যে!



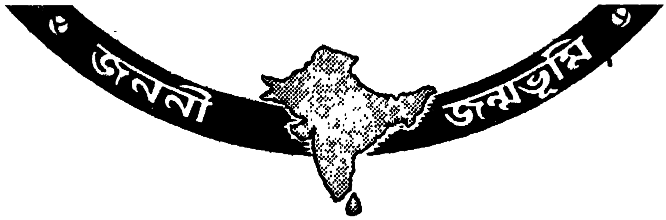
—'এমন বৃটিশের বোমা এখনও তৈরী-হয়নি!'—

আকাশে বেড়ে ওঠে শত্রুর আক্রমণ! চারদিকে ফাটতে থাকে বোমা।

একজন জোর করে নেতাজীকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। নেতাজী শান্ত-কণ্ঠে তাকে জানান, আমার গায়ে লাগবে, এমন বৃটীশের বোমা এখনও তৈরী হয়নি!

সেই অগাধ বিশ্বাস আর স্থির বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে যায় আজাদ-হিন্দের সৈন্যরা। তাদের সত্যিই ধারণা হয়, তাদের নেতাজী অমর—দেবতারা তাঁকে করছেন রক্ষা!

আজ সেই নেতাজীকে আমরা হারিয়েছি!



বৃটীশের বোমা যাঁর পাশ থেকে চলে গিয়েছে অথচ যাঁর গায়ে লাগেনি, জননী-জন্মভূমির সেই কৃতী সন্তান···সেই দেবরক্ষিত বীর নাকি বিমান-দুর্ঘটনার আগুনে পুড়ে মরে গিয়েছেন! সেই সংবাদই পরিবেশন করেচে রয়টার।

আমরা সে-কথা বিশ্বাস করি না।

স্বনামখ্যাত আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারক ডক্‌টর রাধাবিনোদ পাল জাপান পরিভ্রমণ করে এসে আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন, সেই বিমান-দুর্ঘটনার সংবাদ মিথ্যা।

তাহলে নেতাজী কোথায় গেলেন?

যদিও তাঁর মৃত্যু হয়ে থাকে, তাহলে কি স্বাধীন-ভারতের আজ ঐকান্তিক চেষ্টা করা উচিত নয় যে, তিনি কোথায়, কি ভাবে দেহরক্ষা করেছেন, তার সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করা?

এটা কি আমাদের একটা প্রধান জাতীয় কর্ত্তব্য নয়?

জগতের কোন্ অজানা মাটিতে কোথায় অপূজিত পড়ে রয়েছে ভারতের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সন্তানের পবিত্র দেহ, তার অনুসন্ধান করা কি আমাদের স্বাধীনরাষ্ট্রের দায়িত্ব নয়?

তিনি মরে গিয়েছেন, অতএব তিনি মরে পড়ে থাকুন, এইটুকুই কি নেতাজীর প্রাপ্য তাঁর দেশবাসীর কাছ থেকে?

কোথাও কোন সত্যিকারের চেষ্টা নেই, এই রহস্যের মীমাংসার জন্যে! এই নির্ম্মম উদাসীনতাই প্রতিদিন রূঢ়তর হয়ে বাঙালীর অন্তরে কাঁটার মতন ফুটেছে।

সেইসঙ্গে মায়াবী আশা নিরন্তর কানে-কানে এই আশ্বাস দিয়ে চলেছে, তিনি আসবেন···তিনি আবার ফিরে আসবেন!



চারজন মানুষের মতন মানুষ

একটা মজার ব্যাপার, তোমরা লক্ষ্য করে দেখেছ কিনা বলতে পারিনা। বর্ত্তমান ভারতের ইতিহাসে পরপর এমন চারজন লোক জন্মগ্রহণ করেছেন, যাঁদের নাম লোকে আদর করে···ভালবেসে যা দিয়েছে, সেই নামেই তাঁরা পরিচিত, এবং তাঁদের সেই নতুন নাম বা নতুন উপাধি যাই বলনা কেন, তাঁদের এমনভাবে মানিয়েছে যে, সেই নামে আরো হাজার লোক থাকলেও, লোকে ঠিক তাঁদেরই বোঝে। ভারতবর্ষে হাজার-হাজার ধার্ম্মিক-সন্ন্যাসী লোক স্বামী উপাধি নেন, কিন্তু স্বামীজী বলতে বিবেকানন্দকেই বোঝায়; উত্তর-ভারতে ঘরে-ঘরে ছেলেরা বাবাকে বাপু বলে, কিন্তু বাপুজী বলতে ভারতের স্বাধীনতার জনক মহাত্মা গান্ধীকেই বোঝায়; শত-শত নেতা ভারতবর্ষে ছিল বা আছে, কিন্তু নেতাজী বলতে সুভাষচন্দ্রকেই বোঝায়···হাজার-হাজার কাশ্মিরী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মধ্যে পণ্ডিতজী বলতে জওহরলালকেই বোঝায়। এই যে চারজন লোক, এঁদের মধ্যে আবার একটা আশ্চর্য্য মিল আছে, কেউ কারুর আত্মীয় না হলেও, এঁদের প্রত্যেকের মধ্যে একটা অতি-ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা আছে, একজন আর-একজনকে সম্পূর্ণ করেছে, এবং এই চারজনকে একসঙ্গে নিয়ে বর্ত্তমান ভারতবর্ষ গড়ে উঠেছে।



এঁদের জীবন আর সাধনার কথা তোমরা প্রত্যেকেই জানো, অন্তত জানা উচিত ; আজ এখানে তোমাদের সঙ্গে এই চারজনকে নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই। আমি যেভাবে আলোচনা করলাম, সেইটেই শেষ কথা নয়। তোমাদের সময় কাটাবার জন্যে একটা মজার খেলা বলছি। পরীক্ষা করে দেখতে পারো। তার জন্যে চারজন দরকার। চারজন বন্ধু। এই চারজন মহাপুরুষের পক্ষ নিয়ে তোমরা চারজন ওকালতী করতে পারো। তোমাদের গুরুস্থানীয় কাউকে বিচারক করতে পারো। একে-একে বিচারকের সামনে তোমরা যে যাঁর পক্ষ অবলম্বন করেছ, তার সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবে। বিচারক শেষকালে রায় দেবেন, কার ওকালতী সবচেয়ে ভাল হয়েছে।

তোমাদের ওকালতীর সুবিধার জন্যে আজ এখানে এই চারজনের সম্পর্কের কথা তোমাদের বলছি। এই চারজনের মধ্যে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের কোথায় মিল, আর কোথায়-বা তফাৎ, আমি যেমন ভেবেছি, তেমনি তোমাদের বলছি। তোমরা তোমাদের মতন করে ভাবতে চেষ্টা করবে। তোমাদের কারুর ভাবনার সঙ্গে আমার ভাবনা যদি মিলে যায়, নিজেকে সুখী মনে করবো।



—স্বামীজী—

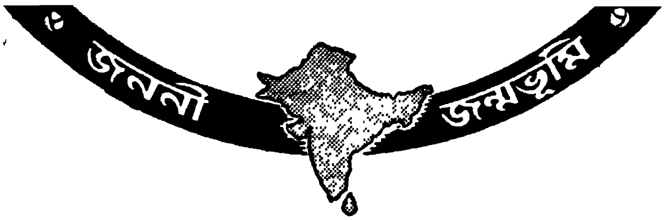
স্বামীজীর সঙ্গে আর-তিনজনের একটা প্রধান তফাৎ হলো, স্বামীজী সন্ন্যাসী ছিলেন, অন্য তিনজন রাজনৈতিক। কিন্তু চারজনেরই লক্ষ্য এক, আদর্শও প্রায় এক। স্বামীজীর মধ্যে যে গম্ভীর ধর্মের ভাব ছিল, বাপুজী আর নেতাজীর মধ্যেও তা ছিল। একমাত্র পণ্ডিতজীর মধ্যে সেইরকম ধর্মের ভাব নেই। পণ্ডিতজীর সঙ্গে সেইখানেই আর



তিনজনের প্রধান তফাৎ। অপর তিনজন ধর্ম্মকে যতখানি বিশ্বাস করেন, পণ্ডিতজী বিজ্ঞানকে ততখানি বিশ্বাস করেন। পণ্ডিতজীর মন বর্ত্তমান-যুগের বৈজ্ঞানিকের মন। তাই ধর্ম্ম নিয়ে তিনি আলোচনাই করেন না; স্পষ্ট বলেন, ধর্ম্ম বলতে সাধারণ লোকে যা বিশ্বাস করে, তা আমি বুঝতে পারি না। বুঝতে চেষ্টা করেছেন কি না, তা আমরা জানি না।

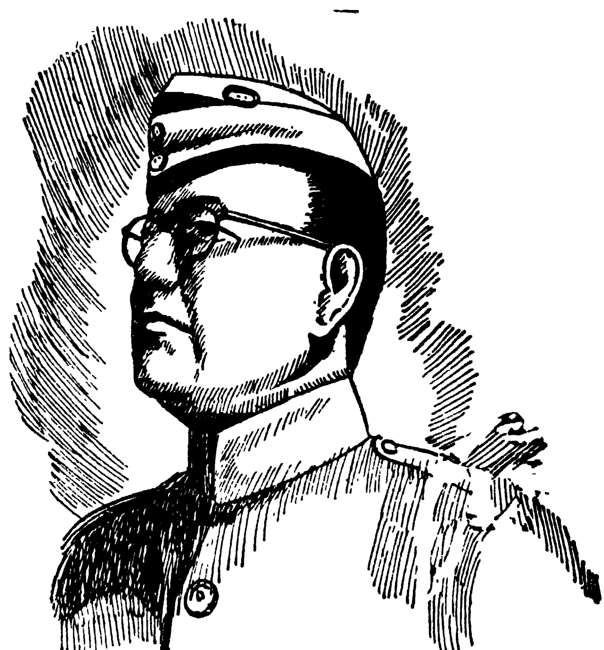

—বাপুজী—

এই তফাতের দরুণ পণ্ডিতজীর চরিত্রের সঙ্গে অপর তিনজনের চরিত্রের আর-একদিকে একটা মস্তবড় তফাৎ আছে। স্বামীজী আর নেতাজী আজীবন ব্রহ্মচারী, তাঁরা যে হঠাৎ ব্রহ্মচারী, তা নন; ব্রহ্মচর্য্যকে জীবনের সবচেয়ে বড় আদর্শ বলেই তাঁরা দুজনে গ্রহণ করেছিলেন। বাপুজী বিবাহিত হলেও, তিনিও বিশ্বাস করতেন, জীবনকে পূর্ণ বিকশিত করতে হ'লে, ব্রহ্মচর্য্যের প্রয়োজন। তাই বাপুজী পত্নীর অনুমতি নিয়ে পরে ব্রহ্মচর্য্য পালন করেছিলেন। স্বামীজী পুরোপুরি সন্ন্যাসী হয়েও, রাজনীতির চরম কথা ব'লে গিয়েছেন; বাপুজী পুরোপুরি রাজনৈতিক হয়েও ধর্ম্মজীবন যাপন করে গিয়েছেন। ধার্ম্মিকদের মধ্যে স্বামীজীর চেয়ে বড় রাজনৈতিক কেউ ছিলেন না। রাজনৈতিকদের মধ্যে বাপুজীর চেয়ে ধার্ম্মিক কেউ ছিলেন না। স্বামীজী, বাপুজী আর পণ্ডিতজী, ইংরেজদের সঙ্গে, পাশ্চাত্যদেশের লোকদের সঙ্গে যেভাবে মিশেছিলেন, নেতাজী তা মেশেন নি! স্বামীজী, বাপুজী, পণ্ডিতজী, কোনো কোনো ইংরেজকে প্রাণ থেকে ভালবাসতেন, এমন কি এই তিনজনের প্রত্যেকের অন্তরঙ্গ বন্ধু বা অন্তরঙ্গ শিষ্যরূপে একজন-না-একজন



ইংরেজ ছিলেন। নেতাজীর সব ভালবাসার বন্ধন এই দেশে। স্বামীজী, বাপুজী আর পণ্ডিতজী ইংরেজী-লেখায় যে নাম করেছেন, নেতাজী তা পারেন নি। স্বামীজী, বাপুজী আর পণ্ডিতজী, তিনজনে ভারতবাসী হয়েও ইংরেজী ভাষা যেভাবে লিখেছেন, তাতে ইংরেজরাও বিস্মিত হয়েছে। চারজনেই সাক্ষাৎ-ভাবে পাশ্চাত্য-জগৎকে বিশেষভাবে দেখেছিলেন। বাপুজী, নেতাজী আর পণ্ডিতজী তিনজনেই ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন শিক্ষালাভ করবার জন্যে, স্বামীজী ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন, তাদের শিক্ষা দেবার জন্যে।

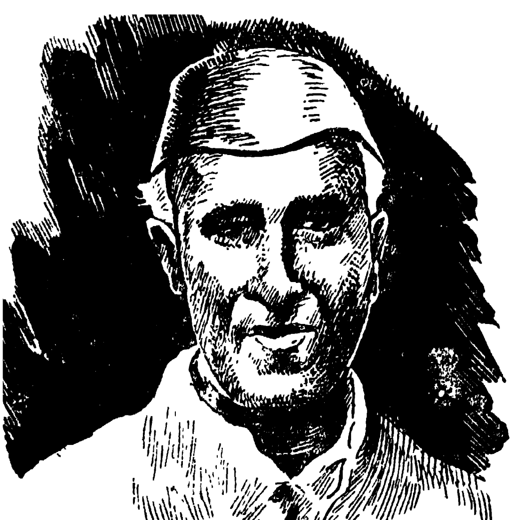
এই চারজনের মধ্যে স্বামীজী জন্মেছেন সকলের আগে, এই পৃথিবী থেকে চলেও গিয়েছেন সকলের আগে। স্বামীজীই আর-তিনজনের জন্যে পথ তৈরী করে দিয়ে যান। এই চারজনের মধ্যে তিনিই প্রথম খুঁজে বার করেছিলেন, ভারতের দুর্ব্বল অসহায় মূক জনগণকে। তিনিই ঘোষণা করে যান, এই দরিদ্র ভারতবাসী, এই মূর্খ ভারতবাসী, এই কৃষক ভারতবাসী, এই মজুর ভারতবাসী, ইহারাই হইল আমার ভাই। ইহাদের সেবাই জীবনের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান রাজনীতিতে যে উদার সাম্যবাদের সুর শোনা যায়, স্বামীজীই ব্যগ্রকণ্ঠে স্পষ্ট ভাষায় তা সকলের সামনে তুলে ধরেন। স্বামীজী

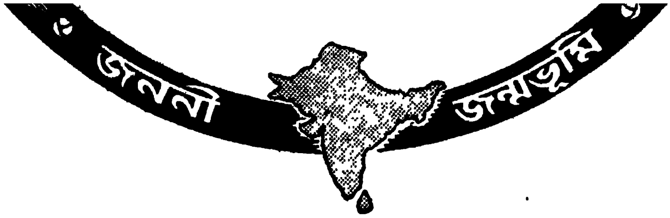


—নেতাজী—



যে দরিদ্র-নারায়ণের সেবার আদর্শ প্রচার করে গেলেন, বাপুজী এসে তাকেই কর্ম্ম-জীবনে সত্য করে তুললেন। স্বামীজী এসে জাতিভেদের শেকড় ধরে নাড়া দিয়ে যান, বাপুজী এসে তাকে শেকড়-সুদ্ধ মাটি থেকে তুলে ফেলতে চেষ্টা করেন। বাপুজী স্বামীজীর লেখা পড়ে কৃতার্থ হয়েছিলেন। নেতাজী স্বামীজীর লেখাকে জীবনের আদর্শ করেছিলেন। নেতাজী স্বামীজীকে জীবনের আদর্শ ব'লে নিয়েছিলেন, পণ্ডিতজী বাপুজীকে তাঁর কর্ম্মজীবনের আদর্শ ব'লে গ্রহণ করেছেন। নেতাজী আর পণ্ডিতজী ত্বজনকেই তাঁর যোগ্য শিষ্য ব'লে বাপুজী জানতেন। নেতাজী আর পণ্ডিতজী ত্বজনেই বাপুজীকে তাঁদের কর্ম্ম-জীবনের দীক্ষাগুরু ব'লে স্বীকার করেছিলেন। পণ্ডিতজী বাপুজীকে এতখানি বিশ্বাস করতেন যে, বাপুজীর সঙ্গে তাঁর মতের মিল না হলেও, তিনি বাপুজীর কথা মত চলতে পারতেন। বাপুজী তাঁকেই তাঁর উত্তরাধিকারী ব'লে ঘোষণা করেন। নেতাজী বাপুজীকে এতখানি শ্রদ্ধা করতেন যে, তাঁর কথার উল্টা যেতেও তিনি ভয় করতেন না। পণ্ডিতজী কোনদিন বাপুজীর সঙ্গে প্রকাশ্যে ঝগড়া করেন নি; নেতাজী করেছেন। পণ্ডিতজী সব সময়ে বাপুজীকে নেতা ব'লে শ্রদ্ধা করতেন, নেতাজী যখন ইচ্ছা করলে বাপুজীর কথাকে অস্বীকার করতে পারতেন, তখনও তিনি বাপুজীকে নেতা ব'লে সমান শ্রদ্ধা জানাতেন। স্বামীজীর মধ্যে যে বীরত্ব ছিল, নেতাজীর মধ্যে তা ফুটে উঠেছে। বাপুজীর মধ্যে যে সাধুতা আর সততা ছিল, পণ্ডিতজীর মধ্যে তা

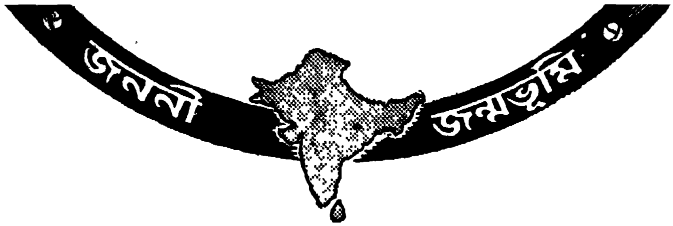

—পণ্ডিতজী—



ফুটে উঠেছে। নেতাজী স্বামীজীর মানস-সন্তান, পণ্ডিতজী বাপুজীর মানস-সন্তান। স্বামীজী সন্ন্যাসী, নেতাজীও সন্ন্যাসী ; বাপুজী সংসারী, পণ্ডিতজীও সংসারী।

একটি জায়গায় চারজনের সমান মিল, চারজনই ভারতবর্ষকে ভালবাসেন, অর্থাৎ 'চিরন্তন ভারতবর্ষকে' ভালবাসেন।

এই চিরন্তন ভারতবর্ষ কি, সেই কথাটাই এখন তোমরা নিজেদের মধ্যে বিচার করে নাও।



প্রাচীন ভারতের এঞ্জিনীয়ার

তাঁর নাম ছিল, সূর্য্য। কে তাঁর পিতা, কেই-বা দিয়েছিলেন তাঁকে শিক্ষা, তার কথা ইতিহাসে কোথাও লেখেনা। শুধু এইটুকু জানা যায় যে, এক দরিদ্র চণ্ডালের ঘরে তিনি লালিতপালিত হয়েছিলেন।

কাশ্মীরে তখন অবন্তীরাজ রাজত্ব করছেন। ৮৮৫ খৃষ্টাব্দে। সেই সময়ে কাশ্মীরের এক নামহীন গ্রামে তখনকার সবচেয়ে বড় এঞ্জিনীয়ার সূর্য্য জন্মগ্রহণ করেন।

ক্রমাগত বন্যার অত্যাচারে কাশ্মীরের তখন মহা-দুর্দ্দিন। দুর্ভিক্ষ তখন নিত্য হয়ে উঠেছে। প্রতি খাড়ি (১০ মণ ১২ সের) ধানের মূল্য ১০৫০ স্বর্ণমুদ্রা হলো। ঘরে-ঘরে লোক অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করতে লাগল।

বন্যার হাত থেকে উদ্ধার না পেলে, দুর্ভিক্ষের হাত থেকে কিছুতেই মুক্তি নেই। রাজ্যের যত বিজ্ঞ লোক সকলেই চিন্তিত। কিন্তু কি ক'রে সেই বন্যার হাত থেকে কাশ্মীরকে রক্ষা করা যায় তা তাঁরা কেউ ভেবে ঠিক ক'রে উঠতে পারলেননা। যজ্ঞ হলো যাগ হলো, দেবতার নামে বহু জিনিষ উৎসর্গ করা হলো, কিন্তু দুর্ভিক্ষের অত্যাচার দিন-দিনই বেড়ে চল্‌ল।

এহেন সময়ে একদিন রাজ-সভায় চণ্ডাল-গৃহে প্রতিপালিত সূর্য্য এসে উপস্থিত হলেন। দ্বিধা না ক'রে বললেন, এই বন্যা আর দুর্ভিক্ষের হাত থেকে আমি রক্ষা করতে পারি কাশ্মীরকে!



সবাই চমকে তার দিকে চাইল।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, কি উপায়ে?

সূর্য্য বললেন, রাজ-কোষ থেকে মুক্ত হস্তে আমার পরামর্শমত আপনাকে শুধু অর্থ প্রদান করতে হবে। সভাসদ্‌রা সকলে হেসে উঠলো। পাগল!

কিন্তু অবন্তীরাজ সূর্য্যের অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় মুখের দিকে চেয়ে বললেন, তাই হবে!

বিতস্তা নদীর তীরে নন্দক গ্রাম। বন্যার জলে নন্দক একেবারে জলমগ্ন হয়েছিল। প্রথমে সূর্য্য সেই গ্রামে উপস্থিত হলেন। রাজকোষ থেকে থলে-থলে স্বর্ণমুদ্রা এনে উন্মাদের মত সূর্য্য সেই বন্যার জলে ফেলতে লাগলেন। তারপর নন্দক গ্রাম ছেড়ে যক্ষোদর নগরে এলেন। যক্ষোদরও ছিল জলমগ্ন। সেখানেও তিনি স্বর্ণমুদ্রা তেমনিভাবে জলের মধ্যে ছড়াতে লাগলেন। দেখতে-দেখতে তাঁর এই পাগলামির কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। রাজসভায় সভাসদ্‌রা অবন্তী-রাজকে তিরস্কার করতে লাগলেন, মহারাজ, একটা পাগলকে নিয়ে আপনি একি ভুল করলেন!

কিন্তু অবন্তীরাজের মন বল্‌লো, তবুও এমন পাগল তো আর দেখিনি! প্রকাশ্যে বললেন, আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো! রাজকোষের দ্বার বন্ধ করতে কতক্ষণ?

যক্ষোদর নগরের দুদিকে দুই পাহাড়। এক পাহাড়ের ওপর উঠে সূর্য্য দেখলেন, পঙ্গপালের মত লোক নন্দক আর যক্ষোদর গ্রামের দিকে আসছে! তারা খবর পেয়েছে, বন্যার জলের তলায় অজস্র স্বর্ণ-মুদ্রা আছে। গল্প-কথা নয়—সূর্য্য এখনও দাঁড়িয়ে বন্যার জলে স্বর্ণ-বৃষ্টি করছে!

সেই বন্যার জলের তলায় ছিল পাহাড়-থেকে-খসা বড় বড় পাথর! অর্থের লোভে উন্মাদ হয়ে হাজার-হাজার লোক জীবনমরণ পণ ক'রে—সেই-সব পাথর

সরাতে লাগল! একে দুর্ভিক্ষ, তাতে স্বর্ণমুদ্রা! অসাধ্য সাধন করবার এর চেয়ে বড় প্রেরণা দুর্ব্বল মানুষের আর কি হতে পারে?

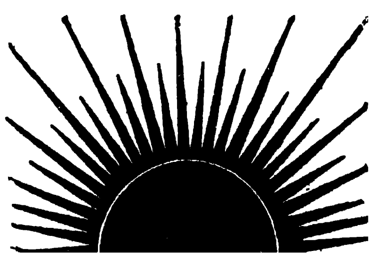
সূর্য্য পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখছিলেন। আনন্দে, আশায় তাঁর বুক ক্ষণে-ক্ষণে কেঁপে উঠছিল। রাজসভায় ব'সে কিন্তু লোকেরা যখন পরামর্শ করছিলেন, তখন সূর্য্য বিতস্তা নদীর তীর ধ'রে জলমগ্ন গ্রামগুলো ঘুরে-ঘুরে দেখে এসেছেন। যক্ষোদর নগরে এসে দেখলেন, দুই পাহাড় থেকে বড়-বড় পাথরের চাঁই দিনের পর দিন প'ড়ে বিতস্তার ক্ষীণ গতি রোধ করেছে। তাই যখন নদীতে বন্যা আসে, বন্যার জল বেরুবার রাস্তা না পেয়ে, সমস্ত গ্রাম গ্রাস ক'রে ফেলে। সেই পাথর সরিয়ে শীর্ণা নদীকে সংস্কার না করলে বন্যার হাত থেকে মুক্তি নেই! সূর্য্য জানতেন, সহজভাবে এই কথা জানালে, সেই ভয়াবহ কাজে হয়ত কাউকেই পাওয়া যেতো না!

স্বর্ণের লোভে বহু লোক সেই জলে দেহ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিল! কিন্তু দেখতে-দেখতে পাথর সরে গেল, বিতস্তার জল বন্ধনমুক্ত হয়ে বেরিয়ে গেল। জল নিঃশেষ হওয়া মাত্র সূর্য্য সাতদিনের মধ্যে বিতস্তার মুখে একটি পাথরের বাঁধ বাঁধলেন। তারপর সেই শীর্ণা নদীর তলা থেকে আবর্জ্জনা আর মাটি তুলিয়ে ফেলে বাঁধ আবার ভেঙে দিলেন। বিপুল গৌরবে বিতস্তা সাগরের দিকে ছুটে চলল। জলমগ্ন গ্রামগুলো আবার মাথা তুলে উঠল। মাঠে-মাঠে সোনার ফসল আবার দেখা দিল। কাশ্মীরের ঐতিহাসিক-কবি কহ্লণ পণ্ডিত বলছেন, স্নান শেষ ক'রে শ্যামাঙ্গিনী আবার সোনার আঁচল গায়ে জড়াল।

চণ্ডাল গৃহে পালিত সূর্য্য হলেন রাজ্যের এঞ্জিনীয়ার। তাঁর আদেশে কাশ্মীরে বহু খাল কাটান হলো। বামদিকে সিন্ধু আর দক্ষিণে বিতস্তা প্রবাহিত ছিল। এই দুই নদীর ধারাকে তিনি বন্যস্বামী ব'লে এক জায়গায় নিয়ে এসে মিলিত



করিয়ে দিলেন। এ যে কত-বড় দুরূহ কাজ তা বলা যায়না। কিন্তু কহ্লণ-পণ্ডিত যখন জীবিত ছিলেন তখন তিনি এই কৃত্রিম সংযোগ স্বচক্ষে দেখেছিলেন। মহাপদ্ম-হ্রদের জল-প্রবাহকে রোধ করবার জন্যে তিনি ৫৬ মাইল ব্যাপক পাথরের বাঁধ তৈরী করান এবং বিতস্তাকে এনে এই হ্রদের সঙ্গে মিশিয়েছিলেন। যেখানে মহাপদ্ম-হ্রদের সঙ্গে বিতস্তাকে তিনি মিলিয়েছিলেন, সেইখানে তাঁর নামে একটি বৃহৎ নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই নগরের নাম হয়, সূর্য্য-কুণ্ডল। তিনি এক বিরাট সেতু করেন। সেই সেতুর নাম ছিল, সূর্য্য-সেতু। বহুদিন পর্য্যন্ত সেই সূর্য্য-সেতু বিদ্যমান ছিল।





অসমাপ্ত কর্ত্তব্য

একজন বিদেশী পর্য্যটক তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীর মধ্যে এক জায়গায় বর্ণনা করেছেন যে, নগর ছাড়িয়ে এক সুদূর অরণ্যের মধ্যে তিনি বহুকালের পুরনো একটা বাড়ী দেখতে পেলেন। লোকজন কোথাও কেউ নেই। সেই বাড়ীর দরজায় শুধু লেখা, 'যদি শেষ না করো, তবে আরম্ভ করো না।'

কোন্ খেয়ালে কে সেই কথা-কয়টি লিখেছিল, জানিনা। কিন্তু জীবনের সবচেয়ে বড় কথা সে লিখে রেখেছিল, যদি শেষ না করো, তবে আরম্ভ করো না।

অসমাপ্ত খণ্ড-খণ্ড কর্ত্তব্য পরাজিত-জীবনের লক্ষণ। আজ যে-কাজ আরম্ভ করলাম, বাধা-বিঘ্ন এলো, এলো আলস্য, পরের দিন সে-কাজ ছেড়ে দিলাম। এমনি ক'রে জীবনের পথে যারা চলে, পথের ধূলোর সঙ্গে তাদের অসমাপ্ত কাজগুলোর মতই, তারাও অদৃশ্য হয়ে যায়। জগতে তাদের দ্বারা কোন কাজ কখনও হবার সম্ভাবনা নেই।

এডিসন যেদিন প্রথম ইলেক্ট্রিক আলোর বাতি জ্বাল্‌তে পারলেন, তার পূর্ব্বে তাঁকে ৩৫ হাজার বার পরীক্ষা করতে হয়েছিল। ৩৫ হাজার বার পরীক্ষার ফলে—যে-কাজ আরম্ভ করেছিলেন, সে-কাজ শেষ করলেন।

ডাহ্‌লিয়া গন্ধ-হীন ফুল। মায়াবী লুথার বারব্যাঙ্ক বললেন, ডাহ্‌লিয়াকে গন্ধ-যুক্ত করবো। কুড়ি বৎসর ধ'রে দিনের পর দিন অপেক্ষা করার পর ডাহ্‌লিয়াকে তিনি সৌরভময় ক'রে তুললেন।

তুমি, আমি, সবাই পারি এমনি ক'রে গন্ধ-হীন এই জীবন-কুসুমকে সুগন্ধে ভরে তুলতে, যদি মনে রাখি, সেই নির্জ্জন অরণ্যের ধারে, সেই পরিত্যক্ত কুটীরের দ্বারে পরিব্রাজক যে-কথাটি লেখা দেখতে পেয়েছিলেন—'যদি শেষ না করো, তবে আরম্ভ করো না!'





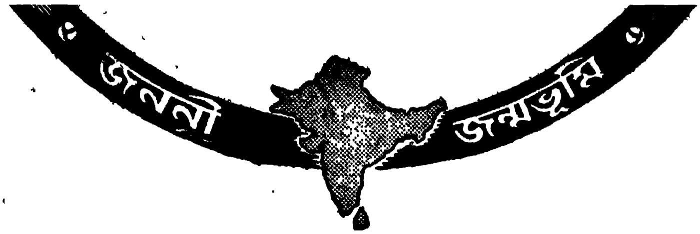
—চরিত্র—

[পুরুষ]

খাজাঞ্চী, মথুর, পূজারী, হৃদয়, ঠাকুর, জটাধারী, কথক, জটা, সুরেন, নরেন, লছমী, (একজন মাড়োয়ারী ভক্ত) যোগীন, রামকুমার, শিষ্য, চাকর, মহেশ, স্মৃতি।

[স্ত্রী]

রাণী রাসমণি, বৃদ্ধা, ব্রাহ্মণী, দৈববাণী।



(আবহ সঙ্গীত)

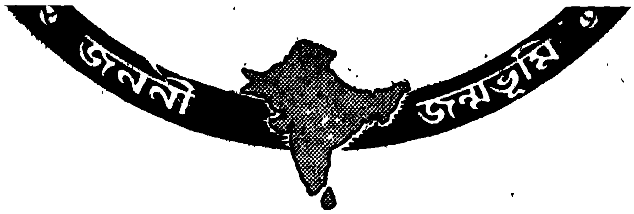
কথক—(সুরে) যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ।

এই মহাবাণীকে সত্য করিবার জন্য উনবিংশ শতাব্দীতে এই বাংলায় যিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন, সেই ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের পুণ্যনাম স্মরণ ক'রে তাঁর অমৃত জীবন-কাহিনী আরম্ভ করছি, আরম্ভ করছি যখন তাঁর বয়স মাত্র সতেরো, তখন গদাধর নামে তিনি পরিচিত, গ্রামে পড়া-শোনা কাজ-কর্ম কিছুই না করার দরুণ তাঁর অগ্রজ রামকুমার তাঁকে সঙ্গে ক'রে কলকাতায় তাঁর টোলে নিয়ে এলেন। সেইসময় জানবাজারেব পুণ্যবতী রাণী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে বিরাট মন্দির তৈরী ক'রে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের কাছ থেকে রূঢ় আঘাত পেলেন···

[আবহ সঙ্গীত থামিয়া গেল]

রাণী রাসমণি—আমার সমস্ত আয়োজন, এইভাবে পণ্ড হয়ে যাবে? মা আমাকে স্বপ্নে নিজে এসে আদেশ দিলেন, তাই কাশীর পথ থেকে ফিরে এসে দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণী আর রাধাকান্তের জন্যে মন্দির তৈরী করলাম···সামনেই স্নানযাত্রার দিন···বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হবে, সব আয়োজন সারা, এখন কিনা শাস্ত্র হলো বাধা? আমার তৈরী মন্দিরে মা'র অন্নভোগ হবেনা? কোন ব্রাহ্মণই আমার পুরোহিত হবেনা? হাঁ বাবা মথুর, একি সত্যি? শুনেছি, হিন্দুধর্ম বড় উদার, তবে আমার এ শাস্তি কেন?

মথুর—আপনার মনে আর আঘাত দিতে চাইনা মা···হিন্দুধর্মের কথা আমি বলতে পারিনা···



রাণী—তুমি জানোনা বাবা, বুকের ভেতরটায় কি যন্ত্রণা হচ্ছে! মা ভবতারিণীকে যদি যথাবিহিত প্রতিষ্ঠা না করতে পারি, তাহলে বোধহয় আমি আর বাঁচবো না।

মথুর—আপনি অত উতলা হবেন না মা! আমি মহেশকে পাঠিয়েছি···ঝামাপুকুর-টোলে রামকুমার চট্টোপাধ্যায় ব'লে তার কে যেন বন্ধু আছেন, তিনি নাকি···

রাণী—মত দিয়েছেন? মত দিয়েছেন তিনি?

মথুর—শুনছি বটে সেইরকম···তাই তাঁকে আনতে পাঠিয়েছি।

রাণী—তুমি নিজে কেন গেলেনা বাবা?

[চাকর প্রবেশ করে]

চাকর—দাদাবাবু!

মথুর—কি রে?

চাকর—মহেশবাবু একজন বামুন-পণ্ডিতকে···

রাণী—এখানে নিয়ে আসতে বল্—যা, শীগ্‌গির যা, আমি ঘোমটা দিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলবো, কি বলো বাবা?

মথুর—হাঁ মা, তাই বলবেন, আমি তো আছি···এই যে মহেশ, ইনিই বুঝি···

মহেশ—হাঁ, রাণীমা, ইনিই ঝামাপুকুর-টোলের পণ্ডিত শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায়···এঁর কথাই আমি বলেছিলাম।

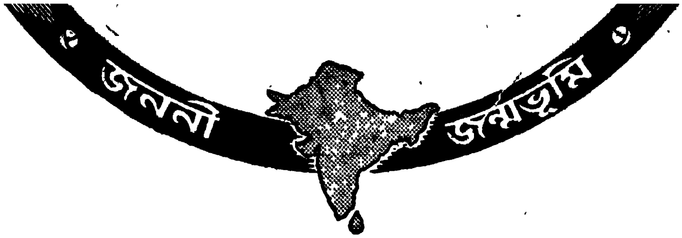
রাণী—আপনি ব্রাহ্মণ···আগে চরণ-ধূলো দিন্···

রাম—থাক্-থাক্ মা, দীর্ঘায়ু হও!

রাণী—আয়ু নিয়ে কি করবো পণ্ডিতমশাই? যদি মা ভবতারিণীর প্রতিষ্ঠা না করতে পারি···

রাম—আমি শুনেছি সব···আপনি অকারণে মনোবেদনা পেয়েছেন। আমাদের শাস্ত্রের নিয়ম কঠোর হতে পারে, কিন্তু, নির্মম নয়। আপনার এ সমস্যার সমাধান স্মৃতিশাস্ত্রে আছে।

রাণী—আছে? সত্যি?



রাম—হাঁ, আপনি আপনার গুরুকে এই মন্দির দান ক'রে দিন, তখন আপনার মন্দিরে নিশ্চয়ই দেবতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে অন্নভোগ গ্রহণ করবেন এবং তখন কোন ব্রাহ্মণেরই পূজা করতে কোন বাধা থাকবেনা।

রাণী—জয় মা ভবতারিণী! জয় মা মঙ্গলময়ী! কি যাতনার হাত থেকে আপনি যে আমাকে বাঁচালেন, তা কি বলবো আমি! ও বাবা, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? দেউড়ীতে দরোয়ানদের ঘণ্টা বাজাতে ব'লে দাও, বাড়ীতে মেয়েরা শাঁক বাজাক, উলু দিক্, আর ভয় কি, মা আমার এসেছে—ওরে, বাজা, বাজা শাঁক।

[শঙ্খ-ঘণ্টার রোল]

কথক—মহাধূমধামে দক্ষিণেশ্বরে বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার উৎসব হয়ে গেল। রাণীর একান্ত অনুরোধে রামকুমারই সেদিন পুরোহিতের কাজ করলেন, কিন্তু রাণী ছেড়ে দিলেননা, নিত্য পূজারও ভার তাঁকে নিতে হলো। তাই ক্রমান্বয়ে সাতদিন আর টোলে ফিরতে পারলেননা। অষ্টম দিনের দিন উৎকণ্ঠিত হয়ে রাণীকে বল্লেন—

রাম—রাণীমা, আজ আমাকে ছুটি দিতেই হবে, আমার ছোট ভাই টোলে একা পড়ে রয়েছে···পাড়াগাঁয়ের ছেলে···পাগলা···

রাণী—সে কি, উৎসবের দিন তাঁকে সঙ্গে আনেননি?

রাম—সেদিন এনেছিলাম বহু কষ্টে···কিন্তু তার মনে ব্রাহ্মণত্বের অভিমান এত বেশী, তাকে কিছুতেই এখানে রাখতে পারলামনা। জানেন, পাগলা সেদিন এখানকার কোন-কিছু মুখে দেয়নি, শুনলুম, বিকেলে মন্দিরের বাইরে থেকে কিছু মুড়ীমুড়কী কিনে খেয়েছিল।

[একজন লোক]

খাজাঞ্চী—এই যে পুরুতমশাই···আপনাকে বাইরে কে খুঁজতে এসেছে।

রামকুমার—নিশ্চয়ই আমার ভাই, গদাই···

রাণী—আচ্ছা বাবা, তাহলে আমি একটু ভেতরটা ঘুরে আসি।

রাম—যা ভেবেছি ঠিক তাই। কি রে গদাই, চিনে আসতে পারলি ?

ঠাকুর—জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে চলে এলাম, কিন্তু তোমার কাণ্ডটা কি ?

রাম—রাণীমা কিছুতেই ছাড়লেননা···নিত্য পূজোর ভারও নিতে হলো···জানিস তো আমাদের সংসারের অবস্থা···একটা চাকরি না হ'লে চলে কি ক'রে ?

ঠাকুর—তা ব'লে বাপ-পিতেমো যা করেনি, তুমি তাই করবে ? তাঁরা কোনদিন শূদ্রের অন্ন খাননি।

রাম—তুই ভুল বুঝছিস্ গদাই···আমি তোকে শাস্ত্র থেকে প্রমাণ ক'রে দেবো··· অন্যায় কিছু করিনি। রাণী রাসমণির যে জাতই হোক্না কেন, এ মন্দির তাঁর গুরুদেবের···সেইজন্যে এই মন্দিরে পূজো কর্লে বা থাকলে আমাদের কোন অন্যায় হয়না, বুঝলি ?

ঠাকুর—আমি মুখ্খু মানুষ···তোমার শাস্তর পড়িনি, জানিওনা···মন আমার সায় দিচ্ছে না, তাই জানি···তাহলে তুমি এখন ফিরছো না ?

রাম—তোরও ফেরবার দরকার নেই···তুইও এখানে একটা কাজ নিয়ে থাক্।

ঠাকুর—না, না, তা কি ক'রে হয় ? তা হয়না···না···

রাম—শোন্ শোন্, কাজ না করিস্, না করবি···চলে যাচ্ছিস্ কেন ? এখানে দু'দিন নাহয় থাকলি···

ঠাকুর—বা রে, থাকবো যদি খাবো কি !

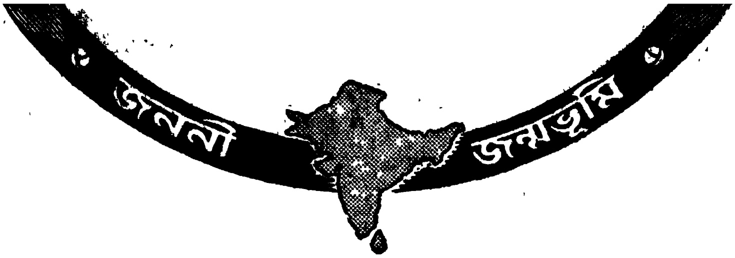
রাম—ও! মার প্রসাদ খেয়েও যদি তোর মন সায় না দেয়, বেশ তো, এখান থেকে সিধে' নিয়ে গঙ্গার ধারে রেঁধে খাবি' আয়, রাণীমা ডাকছেন।

ঠাকুর—ওরে বাবারে···ওসব বড়লোকের সঙ্গে···আমার ভয় করে···

রাম—না রে না। দেখবি, এমন লোক হয়না···এই যে উনি নিজেই আসছেন।

রাণী—পুরুতমশাই···ইনিই বুঝি আপনার ছোট ভাই ? পায়ে ছুঁয়ে তো প্রণাম করতে দেবেননা ঠাকুর, তাই দূর থেকেই করছি।

ঠাকুর—আহা-হা···করেন কি ? থাক্···থাক্।



রাম—রাণীমা, শোনেননি, কি মিষ্টি ও মার নাম গায়···

রাণী—তাহলে তো না শুনে ছাড়ছিনা ছোট-ঠাকুর, আপনাকে ছোট-ঠাকুর বলেই ডাকবো, কেমন ? এবার একটা মা'র নাম শুনি বাবা ?

গান

[গদাধর] মজলো আমার মন্-ভ্রমরা
শ্যামাপদ নীল কমলে।
যত বিষয়-মধু তুচ্ছ হলো,
কামাদি কুসুম সকলে।
চরণ কালো, ভ্রমর কালো,
কালোয় কালো মিশে গেল।
কমলাকান্তের মনে, আশা পূর্ণ এতদিনে
তার সুখদুখ সমান হলো
আনন্দ সাগর উথলে॥

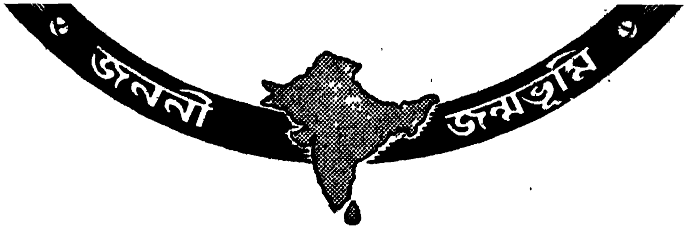
কথক—ক্রমে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে ঠাকুরের ভাগ্নে হৃদয়ানন্দ এসে যোগদান করলেন। হৃদয়ের পীড়াপীড়িতে শেষকালে গদাধর—মা ভবতারিণীর বেশকারের কাজ নিলেন। একদিন মথুরবাবু তাঁকে ডেকে বল্লেন···

মথুর—ছোট্-ঠাকুরমশাই, শুনেছি আপনার ভাল নাম রামকৃষ্ণ, সেই নামই আমি খাতায় লিখেছি, সেই নামেই আপনাকে ডাকবো, কেমন ? ও—গদাই নাম, ভাল লাগে না !

ঠাকুর—তোমার যা অভিরুচি তাই করো। নাম কেন, দেখছি আমার সর্ব্বস্ব বদলাবার ফিকির করেছ তোমরা।

মথুর—কেন ঠাকুর ?

ঠাকুর—মুখ্যুখু মানুষ, একলা ছিলাম, বেশ ছিলাম। ঐ পাগলী বেটীর সঙ্গে আমাকে জুড়ে দিলে···ও সর্ব্বনাশী শেষকালে আমাকে না পাগল করে ! যাই মা'র কাছে—



[এমন সময় বাইরে হট্টগোলের আওয়াজ এলো]

নেপথ্যে— এই, এই গেল গেল···

হায়-হায়, কি সর্ব্বনাশ ! ধর্ ধর্ ধর্

মথুর—কি হলো ?

[একজন হাঁপাতে-হাঁপাতে]

খাজাঞ্চী—সর্ব্বনাশ হয়েছে জামাইবাবু ! ক্ষেত্তর-পূজোরী, রাধাকান্তজীকে শয়ন ঘরে নিয়ে যেতে গিয়ে, পা পিছলে পড়ে গিয়েছে !

মথুর—কি সর্ব্বনাশ ! তার পর ?

খাজাঞ্চী—রাধাকান্তজীর বিগ্রহ ভেঙে গিয়েছে, একটা পা একেবারে ভেঙে গিয়েছে !

মথুর—এঁ্যা ! বলিস্ কি ? কি সর্ব্বনাশ ! একি দুর্গ্রহ ! এই যে পূজোরী-ঠাকুর, এ আপনি কি করলেন ? কি হবে এখন ?

পূজারী—অসাবধানে পড়ে গেলাম ।

মথুর—ঠাকুর-দেবতা নিয়ে···অসাবধানে বল্লেই তো চুকে গেলনা···জানেন, রাণীমা যখন শুনবেন, কি মর্ম্মান্তিক কষ্টই-না তিনি পাবেন ? ভগ্নবিগ্রহ নিয়ে এখন কি হবে ?

খাজাঞ্চী—ভগ্ন-বিগ্রহের তো পূজা নিষেধ ··

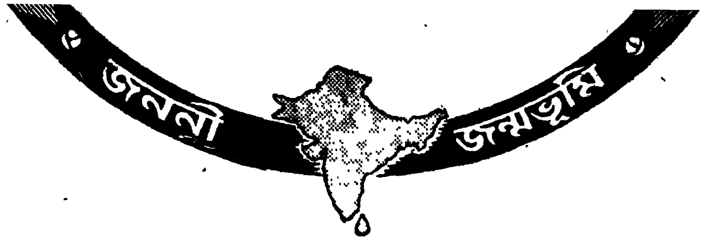
মথুর—আজ রাধাকান্তের তাহলে পূজো হবেনা ? রাণীমাকে বলবো কি ক'রে ? হাঁ···ছোট্-ঠাকুর···কই, ছোট-ঠাকুর কোথায় গেলেন ?

খাজাঞ্চী—তিনি চলে গেলেন গঙ্গার দিকে···

মথুর—স্মৃতিরত্নমশাই নীচে আছেন ?

খাজাঞ্চী—তিনি ঐ যে আসছেন ।

মথুর—স্মৃতিরত্নমশাই, শুনেছেন বিপদের কথা ?



স্মৃতি—সমস্যার কথা। ভগ্ন-বিগ্রহে তো পূজা হয়না! ও বিগ্রহ গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন দিয়ে, নতুন বিগ্রহ তৈরী করিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

মথুর—এত সাধের রাধাকান্ত···অমন অপরূপ রূপ, তাকে ফেলে দিতে হবে? খাজাঞ্চী-মশাই, এই মুহূর্ত্তে খাতা থেকে ক্ষেত্রনাথের নাম কেটে দিন্। তাহলে স্মৃতিরত্নমশাই, এখন করি কি?

স্মৃতি—ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের ডেকে সভা ক'রে একটা মতামত নিন্···তাছাড়া আর গত্যন্তর কি, বলুন? এই যে রাণীমা!

রাণী—মথুর, এত সাধ্য-সাধনা, এত ক্রিয়াকাণ্ডের পর, একি হলো? আমি যে উঠতে বসতে পারছিনা। আমার রাধাকান্ত আজ দুদিন অন্নজল পায়নি···ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা···

মথুর—সকলেই একবাক্যে বল্লেন, শাস্ত্রের বিধান, ভগ্ন-বিগ্রহ ফেলে দিতে হবে···

রাণী—বড়-বড় পণ্ডিতদের···সবাইকে ডেকেছিলে তো?

মথুর—হাঁ মা, সব বড়-বড় পণ্ডিতেরই মত নেওয়া হয়েছে, সবাই একবাক্যে ঐ একই বিধান দিয়েছেন।

রাণী—আমার এত সাধের রাধাকান্ত, তাকে ফেলে দিতে হবে?

মথুর—তাছাড়া তো আর কোন পথ দেখছি না মা!

রাণী—আচ্ছা মথুর, আমার মন কেন জানিনা বারবার বলছে, একবার ছোট্-ঠাকুরকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখলে হয়না?

মথুর (কুণ্ঠিতভাবে)—ছোট্-ঠাকুর তো আর···মানে···পড়াশোনা তেমন···

রাণী—সে জানি মথুর, তবু, আমার মন বলছে তাঁকে একবার জিজ্ঞেস্ করতে। অমন ক'রে পাথরের বিগ্রহকে ভালবাসতে আমি আর দেখিনি। তুমি বিশ্বাস করো মথুর, আমার ধারণা, তিনি সাধারণ মানুষ নন্···কোথায় তিনি?

মথুর—মার মন্দিরের সামনে আপনার মনে ব'সে গাইছেন···

রাণী—চলো···তাঁর কাছেই যাই।

গান

মনের কথা কহিব কি সই,
কহিতে মানা,
দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না।
মনের মানুষ হয় যে জনা,
নয়নে তার যায় গো চেনা
সে দু'এক জনা।
সে যে—রসে ভাসে, প্রেমে ডোবে,
করছে রসের বেচাকেনা ॥

রাণী—বাবা !

ঠাকুর—কি গো, একেবারে মায়ে-বেটায়···ব্যাপার কি ?

রাণী—রাধাকান্তের ব্যাপার সবইতো শুনেছেন বাবা। পণ্ডিতেরা বলছেন, ফেলে দিতে হবে···তাই তোমাকে একবার জিজ্ঞেসা করতে এলাম।

ঠাকুর—বলি, হাঁ গা, এত-সব কাণ্ড···তোমরা করছো কি ?

রাণী—কেন বাবা ?

ঠাকুর—বলি, তোমার যদি কোন অতি-আপনার জন, ধরো তোমার মেয়ে, তার পা ভেঙে যায়···তাহলে তাকে কি তুমি গঙ্গাজলে ফেলে দেবে নাকি ? বলি, কেউ কখনো তা দেয় নাকি ? পা ভেঙেছে, চিকিচ্ছে করো, ভাঙা-পা জোড়বার ব্যবস্থা করো, এই তো সোজা কথা জানি !

রাণী—ঠাকুর ! ঠাকুর ! এত সোজা কথা, এর আগে একবারও মনে ভাবিনি কেন ?

ঠাকুর—ওগো, ভাববে কোথা থেকে বলো ? ঠাকুরকে আমরা সগ্‌গে বসিয়ে, শাস্তরের বেড়া দিয়ে দূরে-দূরে রাখি···একবারও ভুলেও ভাবিনা, সে যে কত-বড় আপনার জন। বলি, মা কি শাস্তর দেখে ছেলেকে বুকে টেনে নেয়, না, ছেলে শাস্তর দেখে মাকে ভালবাসে ?

রাণী—তুমি আজ আমার চোখের বাঁধন খুলে দিলে ঠাকুর! মথুর, এখুনি রাধাকান্তের পা জোড়া দেবার ব্যবস্থা দেখো···

মথুর—তার জন্যে বেশী দূরে যেতে হবেনা মা···তুমি তো দেখনি, মাটি নিয়ে ছোট-ঠাকুর কি সুন্দর সব মূর্ত্তি গড়েন!

ঠাকুর—ভয় নেই গো, ভয় নেই। তোমার রাধাকান্তের পা এমন বেমালুম জুড়ে দেবো যে, দেখবে, ঠাকুরের আমার হেঁটে যেতে একটুও লাগবে না।

কথক—রাণী ও মথুরবাবুর একান্ত ধরাধরিতে ক্ষেত্রনাথের জায়গায় ঠাকুর রামকৃষ্ণ রাধাকান্তের নিত্যপূজার ভার নিতে বাধ্য হলেন। তার ছ'মাস পরে, মা ভবতারিণীর পূজার ভার তাঁর ওপর এসে পড়লো। শ্যামা-মায়ের পূজা করতে-করতে তাঁর মনে নিঃশব্দে এক মহাভাবান্তর ঘটে গেল। পূজা করতে-করতে তিনি স্থানকাল পাত্র ভুলে যেতেন···মন্দিরের লোকে দেখতো, বিগ্রহের সামনে তিনি পাথরের মত স্থির হয়ে বসে আছেন···কোন বাহ্য-চেতনা নেই। একদিন সেইরকম অবস্থায় হৃদয় ডেকে-ডেকে সাড়া না পেয়ে ভীত হয়ে ধাক্কা দিয়ে তাঁকে ডাকে···

হৃদয়—মামা, মামা, এ কি হলো? সাড়া দাও···শুনছো? বেলা যে শেষ হয়ে গেল···সন্ধ্যা-আরতির লগ্ন বয়ে গেল···শোনো···

ঠাকুর—এ্যাঁ···কে? হৃদে? কি হয়েছে রে?

হৃদয়—সেই সকালে কখন পূজোতে বসেছ···আর দেখ তো, সন্ধ্যে পার হয়ে গেল··· সন্ধ্যে-আরতি আর কখন্ করবে?

ঠাকুর—ওরে, আমি আসন থেকে উঠি কি ক'রে? আমাকে উঠতে কি দেয়?

হৃদয়—কি বলছো তুমি? কে উঠতে দেবেনা?

ঠাকুর—ওরে, আসন-শুদ্ধির জন্যে রং মন্ত্র ব'লে যখন আসনের চারদিকে জলের ধারা ছিটিয়ে বসি, আমি স্পষ্ট দেখতে পাই, আসনের চারদিকে আমাকে ঘিরে দাউ-দাউ করে আগুনের শিখা জ্বলছে···ধ্যানে বসবার সঙ্গে-সঙ্গে কে যেন দেহের ভিতরে খট্‌খট্ ক'রে গ্রন্থিগুলোতে চাবি দিয়ে দিলো···যতক্ষণ না সে

আবার চাবি খুলে দিচ্ছে, ততক্ষণ নড়বার-চড়বার আমার নিজের কোন ক্ষমতা থাকেনা।

হৃদয়—তোমার যত সব অনাছিষ্টি কাণ্ড। সেদিন মন্দিরের সব কর্ম্মচারীদের সামনে তুমি কিনা কাঙালীদের শালপাতা থেকে তাদের এঁটো তুলে খেলে ?

ঠাকুর—নইলে পোড়া মন থেকে জাতের অভিমান যে যেতে চায়না রে! মনের মধ্যে কোথায় লুকিয়ে থাকে···তাই তাকে একেবারে ঝেড়ে পোষ্‌কের করতে হবে···ভুলেও যেন মনে না হয়, ও ছোট, বড় আমি···

হৃদয়—তা না হয় হলো···কিন্তু তুমি ভেবেছ লুকিয়ে করছো···কেউ টের পাবেনা··· কিন্তু আমি তো স্বচক্ষে দেখেছি···কি ঘেন্নার কথা···নিজের মাথার চুল দিয়ে পায়খানা পোষ্‌কের ক'রে বেড়াচ্ছো ? মেথররাও যে পারেনা! লোকে যে বদ্ধ পাগল বলবে ? বলি, ঘেন্নাও করেনা ?

ঠাকুর—ওরে, ঘেন্না, লজ্জা, ভয়, তিন থাকতে নয়···নয়···নয়রে! এত ক'রে মাকে বল্‌ছি, আমাকে এমন পাগল ক'রে দে মা, যাতে তোকে ছাড়া আর-কাউকে না চোখে পড়ে···মা কি তা শুনছে ?

হৃদয়—আচ্ছা, তুমি কি চাও বল তো ?

ঠাকুর—ওরে, আমি শুধু মাকে দেখতে চাই···আর কিছু চাইনা। এই যেমন তোকে দেখছি, তোর সঙ্গে কথা বল্‌ছি, তেমনি ধারা অষ্টপ্রহর মাকে আমি দেখতে চাই···স্পষ্ট···জ্যান্ত···কেন সে দেখা দেবেনা ?

হৃদয়—তা কি কখনো হয় ?

ঠাকুর—কেন হবেনা ? যদি মা সত্যিই থাকে, তবে কেন তার দেখা পাবোনা ? এই সেদিনও তো রামপ্রসাদকে সে দেখা দিয়েছিল, তবে আমাকে কেন সে দেখা দেবেনা ? মা···মা···মাগো ?···

[কণ্ঠস্বর ক্রমশ দূরে মিলিয়ে যায়]



(মন্দিরে খাজাঞ্চী, হৃদয় আর জটাধারী)

খাজাঞ্চী—বলি, এই যে হৃদয়ানন্দ, তোমার নয়নানন্দ মামার সন্ধান পেলে নাকি ? সন্ধ্যে হয়ে গেল—বলি, আজও তাহলে মা'র আরতি হচ্ছেনা ?

হৃদয়—সন্ধান তো একরকম পেয়েছি···কিন্তু···

খাজাঞ্চী—কিন্তু আর কি ! বলবে তো, গঙ্গার ধারে মা, মা ব'লে নৃত্য করছেন, নাহয় পাগল সেজে টাকামাটি, টাকামাটি খেলছেন। এই তো ?

হৃদয়—না। আমার বিশ্বাস, তিনি পঞ্চবটীর জঙ্গলের ভেতর ধ্যান করছেন !

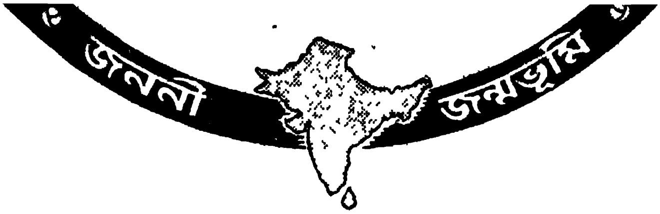
খাজাঞ্চী—এমন শান-বাঁধানো মন্দির থাকতে, কি সুখে জঙ্গলের অন্ধকারের ভেতর লুকিয়ে ব'সে থাকেন, বলতে পারো ? ডেকে আনলেনা কেন ?

হৃদয়—ডাকতেই তো গিয়েছিলাম। বিশ্বাস করুন, পঞ্চবটীর কাছে গিয়ে নাম ধরে ডাকতেই, দেখি, সামনের আমলকী গাছ থেকে দীর্ঘ ত্রিশূলধারী এক রুদ্রমূর্ত্তি ত্রিশূল তুলে আমাকে মারবার জন্যে তাড়া ক'রে এলো। কোনরকমে প্রাণ নিয়ে ছুটে পালিয়ে আসছি···

খাজাঞ্চী—(হাসি) মন্দ গল্প নয়। রাণীমাকে বল্লে হয়তো বকশিস্ পেতে পারো। আমাদের বরাৎ নেহাতই খারাপ। এইরকম একটা পাগলা মামাও নেই যে, ভূত-প্রেতের গল্প তৈরী করবো। কি বলছ হে জটাধারী ?

জটাধারী—হাসি-ঠাট্টার কথা নয় খাজাঞ্চিমশাই ! হৃদয়বাবুর মামা···ওঁর অবশ্য স্বার্থ আছে, উনি রাণীমার কাছ থেকে লুকোতে পারেন, যেমন গোড়ায়-গোড়ায় আমাদের কাছে লুকোতে চেষ্টা করতেন···কিন্তু আমরা রাণীমার চাকরি করি···আমাদের উচিত, রাণীমাকে সব কথা জানানো···তাঁর এত সাধের প্রতিষ্ঠা-করা ঠাকুর···বলি, তার পূজো তো হচ্ছেনা, হচ্ছে—ভূতের নেত্য। এ পাপ তো তাঁকেই স্পর্শাবে, তাই না কি বলুন আপনি ?

খাজাঞ্চী—সত্যি কথাই। বলতে পর্য্যন্ত আমাদের পাপ হয়। মা-কালীর নৈবিদ্যি···



কাল দেখি, সোজা বেড়ালকে ডেকে খাইয়ে দিলো ! কি সর্ব্বনাশ ! কাঁচা-খেকো দেবতা, তাকে নিয়ে এমন হেনস্থা !

জটাধারী—আরে, বেড়ালকে খাইয়ে দিলো ! সে তো তবু ভাল। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, স্রেফ্ নিজে খেতে আরম্ভ করে, তারপর সেই এঁটো নিয়ে মা ভবতারিণীর মুখের সামনে···কালী···কালী···বলতেও আমার ভয় লাগছে।

খাজাঞ্চী—ভয় লাগে না ? বলো কি হে ! সেদিন গিয়ে দেখি, আরে, কোথায় পূজো, কোথায় কি ! দিব্যি মা ভবতারিণীর শয্যার পাশে ছোট ছেলেটির মতন কুঁকড়ে-শুকড়ে শুয়ে আছে। উঃ···ভাবতেও বুক কেঁপে ওঠে···রাণীমাকে ব'লে এর একটা বিহিত না করলে, আমি বলছি, দেখে নিয়ো, মহা-অনর্থ হয়ে যাবে।

[একা বৃদ্ধা প্রবেশ করে]

বৃদ্ধা—বলি, হাঁ গা, মন্দিরের তোমরা কেউ আছো নাকি এখানে ? এই যে বাবা-রা··· হাঁ গা, তোমাদের পূজোরী-ঠাকুর কি একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছে নাকি ? আহা···

হৃদয়—কি হয়েছে বুড়ী-মা ?

বৃদ্ধা—একাদশী···একটা ডুব দিতে গিয়েছিলাম··আহা, দেখি, বাছা ভাঁটার গঙ্গার কাদা আর বালিতে গড়াগড়ি দিয়ে, ওগো, পাগলের মতন মা-মা ক'রে কাঁদছে আর মুখ ঘসড়াচ্ছে···সর্ব্বাঙ্গ বোধহয় ক্ষয় হয়ে গেল ! যাওনা, নিয়ে এসো না তুলে··· এখুনি হয়তো জোয়ার আসবে, ভাসিয়ে নে যাবে···

হৃদয়—ঘাটের কোন্ দিকে বুড়ী-মা ?

বৃদ্ধা—ওগো, ঘাটে গেলেই শুনতে পাবে···বুক চিরে কাঁদছে গো···ঐ···ঐ শোনো···

(আবহ সঙ্গীত ও অস্পষ্ট ক্রন্দন ধ্বনি—মা—মা !)

ঠাকুর—মা, মাগো···আমি শাস্ত্র জানিনা···মন্ত্র জানিনা···পূজা জানিনা···বিধি জানিনা ···শুধু জানি, তুই মা আমার মা—আমার স্বর্গ-মর্ত্ত্য ত্রিভুবন তুই মা আমার···কৈ,



দেখা দিলি কৈ? দিনের পর দিন চলে যায়···কবে দিবি দেখা? মাগো, দেখা দে মা! দেখা দে···দেখা দে মা!

(ক্রমে স্বর মিলিয়ে গেল)

[হাত-ঘণ্টার শব্দ, সেইসঙ্গে ঠাকুর পূজার শেষে দেবীর স্তব পাঠ করছেন]

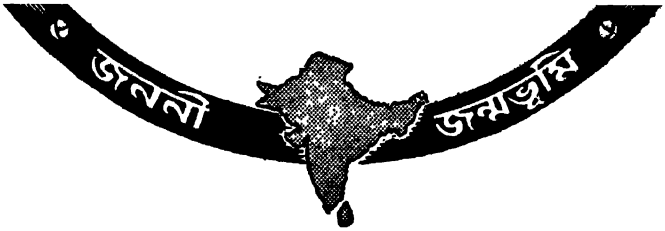
ঠাকুর— দেবী প্রপন্নার্ত্তি হরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোখিলস্য
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবী চরাচরস্য···

এ কার স্তব করছি আমি? কাকে পূজো করছি? ঐ পাষাণ-মূর্ত্তি! না, না, ও তো নিশ্চল স্থির···পাথর···তবে? তবে কাকে আমি নিশিদিন ডাকছি? ও যদি আমার মা নয়, তবে কে আমার মা? তবে কি···আমি বৃথাই কেঁদে সারা হলাম? না না···এই তোমার নিশ্বাস আমার গায়ে এসে লাগলো···ঐ তো দুলে উঠলো মার গলার রক্তকমল! তবে···তবে কেন তুই মূর্ত্তি ধরে আমার সামনে দেখা দিবিনা? কেন তুই ঐ মূর্ত্তির আড়ালে লুকিয়ে থাকবি? বেশ, এমনি ক'রে লুকিয়ে থেকে আমাকে কাঁদাতেই যদি তোর সাধ, তবে কি সুখ আর এই জীবনে? তোর হাতের ঐ খড়্গ দিয়েই এই মুহূর্ত্তে নিজের মুণ্ড কেটে তোর পায়ে অঞ্জলি দেবো···সেই যদি তোর সাধ···তবে এই নে মা অঞ্জলী···

দৈববাণী—ওরে পাগল—এই দেখ—আমি এসেছি—

ঠাকুর—আঃ—এই তো—এই তো পেয়েছি দেখা—কি আনন্দ—ওমা, একি আনন্দ···একি আলো—এ যে আলোর জোয়ার—আমি যে ডুবে যাচ্ছি—তলিয়ে যাচ্ছি—হারিয়ে যাচ্ছি মা—আমাকে তুলে ধর—কেড়ে নিস্ নি মা আমার জ্ঞান···মা···মা···মাগো

[অচৈতন্য হয়ে পড়ে যাবার শব্দ, পূজার বাসন-পত্রের ঝনঝনানি]



হৃদয়—মামা···মামা···একি হলো একেবারে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছেন···

নেপথ্যে খাজাঞ্চী—ওরে, জল নিয়ে আয়, জল···বাতাস কর্···বাতাস কর্···ছোট ভটচাজ···ছোট ভটচাজ ?

[আবহ সঙ্গীতে একটা সরু বেহালার সুর]

ঠাকুর—কৈ ? কোথায় গেল ? এই যে আমার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল ? ওরে, বলনা কোথায় গেল ?

হৃদয়—কে ? কার কথা বলছো ?

ঠাকুর—ওরে, আমার মা,···আমার মা রে···আজ জ্যান্ত প্রত্যক্ষ দেখেছি মাকে··· আমার সঙ্গে কথা বল্লে। হাঁরে···হাঁ···আহা, কি রূপ···কি আলো···আলোর জোয়ার রে! আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল···তলিয়ে দিলো···ধরতে পারলাম না···আমি ছুঁতে পারলাম না···

হৃদয়—স্থির হও···অত উতলা হয়ো না···

ঠাকুর—ওরে স্থির আমি হবো কি করে ? আমি যে জেনেছি, মা আমার আছে···আর তো আমার সন্দ নেই···তবে, তবে কেন চোখ চাইলেই তাকে দেখতে পাবো না ? কেন সে এমনি ক'রে দেখা দিয়ে লুকিয়ে গেল ? ওরে, আমি যে না দেখে থাকতে পাচ্ছি না রে···

হৃদয়—তুমি চলো, ঘরে চলো···

ঠাকুর—না···না···ঘরে যাবো না···এই তো আমার ঘর···তোরা যা···তোরা যা··· তোরা থাকলে হয় তো মা আমার আসবে না···মাকে না দেখে আমি কিছুতেই উঠছি না, আর বেটী পালাবে কোথায় ? আমি একতিলও মার কাছ-ছাড়া হবো না···এত তিলও না—

কথক—এই সময় থেকে দীর্ঘ ছু'বছর কাল ধরে এক অপরূপ অবিচ্ছেদ দিব্য-উন্মাদনার মধ্যে ঠাকুরের দিন কেটে যায়। যখন যেভাব মনের মধ্যে প্রবল হতো, সেই ভাবেই একেবারে তন্ময় হয়ে যেতেন। রামভক্ত মহাবীরের ভক্তির কথা স্মরণ

ক'রে তিনি নিজেকে মহাবীর ভেবে শ্রীরামচন্দ্রের দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। লোকে ধরে নিলো, তিনি বদ্ধ পাগল হয়ে গিয়েছেন···লোকমুখে সমস্ত বিবরণ শুনে রাণী একদিন নিজে দেখতে এলেন···

খাজাঞ্চী—কি বলবো রাণী-মা, এখন আর পাগলামীর সীমা-পরিসীমা নেই···কিছুদিন আগে, কি মনে হলো, হনুমানের মতন রাতদিন গাছে-গাছে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

জটা—সত্যি রাণী-মা, হনুমানের মতন কাপড়ের ল্যাজ ক'রে প'রে থাকতো আর হনুমানের মতন লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াতো।

খাজাঞ্চী—খাওয়া-দাওয়া পর্য্যন্ত ছেড়ে দিয়েছিল···কখনো-কখনো খোলা-সুদ্ধ আস্ত কলা বা ফলটা-আসটা খেতো।

রাণী—কি আশ্চর্য্য!

খাজাঞ্চী—বাড়াবাড়ি আর সহ্য করতে না পেরে, কাল খুব শাসিয়েছি!···রাণীমা আসছেন, দেবেন এবার মন্দির থেকে তাড়িয়ে!

রাণী—সে কি কথা খাজাঞ্চীমশাই! ও-কথা বলতে গেলেন কেন?

জটা—তবে তো একটু ঠাণ্ডা হয়েছে···ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছে।

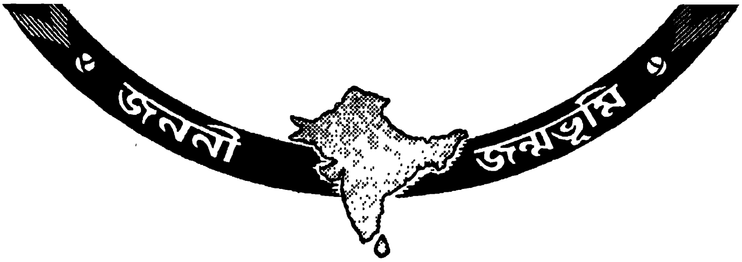
রাণী—ছিঃ, ছিঃ, একি করেছেন আপনারা? তিনি এখন কোথায়?

খাজাঞ্চী—ঐ যে, জামাইবাবু খুঁজতে গিয়েছিলেন, আসছেন।

রাণী—মথুর···এই যে মথুর, বাবার দেখা পেলে?

মথুর—হাঁ মা, পেয়েছি, সারা মন্দির তন্ন-তন্ন ক'রে খুঁজে কোথাও না পেয়ে, মন্দিরের ভেতরটা আর-একবার ভাল ক'রে দেখতে গিয়ে দেখি, মা ভব-তারিণীর মূর্ত্তির আড়ালে ছোট ছেলেটির মতন মা'র কাপড় ধরে লুকিয়ে আছেন আর কাঁদছেন।

ঠাকুর—মাগো, ওরা বলছে, তোর কাছ থেকে নাকি আমাকে তাড়িয়ে দেবে! না মা, আমি যাবো না, আমি তোর কাছ থেকে যাবো না।



রাণী—বাবাঠাকুর !

ঠাকুর—না, না, আমি যাবো না···মা'র কাছ থেকে আমি যাবো না।···ওগো, আমাকে তাড়িয়ে দিয়ো না।

রাণী—কার সাধ্যি আপনাকে এখান থেকে তাড়ায় !

ঠাকুর—তবে ওরা কেন বলছিল ? তুমি ওদের ব'লে দাও,···ওদের ব'লে দাও তুমি···

রাণী—আপনার যা খুসী তাই করবেন,···আমি বলছি, কেউ আপনাকে কিছু বলতে পারবে না।

ঠাকুর—জয় মা ! জয় মা ! আর আমার ভয় কি ! ও-মা, শুকনো জ্ঞান আমি চাই না—আমাকে তোর ভক্তের রাজা ক'রে দে মা···আমি আর কিছু চাই না···আর কিছু না···ওরে—শুন্‌ছিস্ ? এ কি ! কি ভাবছিস্ ! এখানেও ঐসব ভাবনা ?

[চপেটাঘাতের আওয়াজ]

খাজাঞ্চী—আরে, ধর্-ধর্, রাণীমাকে চড় মারলে !

জটা—ইস্, পাগলের আস্পর্দ্ধা দেখেছ !

খাজাঞ্চী—ডাক্‌তো সেজোবাবুকে !

রাণী—থামো, কাউকে ডাকতে হবে না।···এ-সম্বন্ধে একটা কথাও তোমরা কেউ উচ্চারণ করতে পারবে না। যাও এখান থেকে···বাবা, আমি সত্যিই ঘোর পাতকী !···আপনি অন্তর্য্যামি !···আপনি ঠিক দেখেছেন, আমি মনে-মনে কালকে আদালতের মামলার কথাই ভাবছিলাম।···এ তো আপনার মারা নয়, আপনার আশীর্ব্বাদ !

কথক—ক্রমশ ঠাকুরের দিব্য-উন্মাদনার কথা বিকৃত হয়ে কামারপুকুরে তাঁর জননীর কাছে পৌঁছিলে তিনি একান্ত কাতর হয়ে তাঁকে বাড়ীতে এনে বিবাহ দিলেন। ঠাকুর নিজেই তাঁর পাত্রীর সন্ধান ব'লে দিলেন। দশবিধ সংস্কারে মানুষকে সম্পূর্ণ হতে হবে। তিনি বলতেন, ঘুঁটিটা সব ঘর ঘুরে-ঘুরে তবে চিকে ওঠে। দেড় বছর কামারপুকুরে থেকে তিনি আবার দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এলেন



এবং তাঁর দিব্য-উন্মাদনা এবার তীব্রতম হয়ে উঠলো। পাগল ব'লে নানারকম চিকিৎসা চলতে লাগলো, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না।

নিজের মনে ঠাকুর একদিন গঙ্গার ধারে ফুল তুলছেন···

ঠাকুর—এমন অবেলায় ঘাটে নৌকো লাগলো যেন···তাইতো! ওরে হৃদে? ও হৃদে?

হৃদয়—কি বলছো?

ঠাকুর—দৌড়ে ঘাটে যা তো? একজন স্ত্রীলোক এসেছে·· গেরুয়া পরা···তাকে ডেকে নিয়ে আয়···যা! হাঁ ক'রে দেখছিস কি?

হৃদয়—ঐ তো···তিনি এদিকেই···ওমা ছুটে আসছে যে!···

ব্রাহ্মণী—এই যে বাবা, উঃ, খুঁজতে-খুঁজতে সারা হয়ে গিয়েছি···অনেক কষ্টে তবে জানতে পেরেছি তুমি এখানে রয়েছ।

ঠাকুর—হাঁগা, তা, সত্যি তুমি আমাকে খুঁজছিলে?

ব্রাহ্মণী—হাঁ বাবা। তোরা তিনজনে এসেছিস, দুজনকে খুঁজে পেয়েছি···বাকি ছিলি তুই। আজ আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হলো···

ঠাকুর—তা, হাঁগা, আমাকে নিয়ে তোমার কি হবে?

ব্রাহ্মণী—ওরে, সেই কথাই তো বল্‌তে আমার আসা···বাবা, কেউ না জানলেও আমি তো জানি, জগৎ উদ্ধারে তুমি আবার এই দেহ ধরেছ···

ঠাকুর—ওরে হৃদে, বলে কি? ওগো, এরা যে আমাকে পাগল বলে! হাঁগা, বলতে পারো, মাকে ডাকতে-ডাকতে এ আমার কি হলো? শেষকালে পাগল হয়ে গেলাম?

ব্রাহ্মণী—না, বাবা, এ তোমার পাগলামী নয়···তোমার দেহে মহাভাবের লক্ষণ প্রকট হয়েছে···চৈতন্যদেবের যা হয়েছিল···এ-সব লক্ষণ শাস্ত্রে আছে বাবা!

ঠাকুর—এই দেখো মা, বেটীর এ আবার কি খেলা!

ব্রাহ্মণী—বাবা, সেই চৈতন্যদেব তুমি উদয় হয়েছ···এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব···তুমি ভেবো না···দেশে যত বড়-বড় পণ্ডিত জ্ঞানী আছে···আমি



তাদের ডেকে, তাদের সামনে শাস্ত্র থেকে প্রমাণ ক'রে দেবো···আজ জগতের বড় দরকারে তোমার আবির্ভাব হয়েছে বাবা !

ঠাকুর—তা, হাঁগা, তুমি যা বল্‌ছো, এই দেহ দিয়ে তা হবে ?

ব্রাহ্মণী—যাতে হয়, তাই দেখবার জন্যেই তো এসেছি···তন্ত্রের চৌষট্টি-রকম বিধিই আমি তোমাকে শিক্ষা দেবো···আমি স্পষ্ট জানি বাবা, তুমি সেই দিব্যশক্তির আধার।

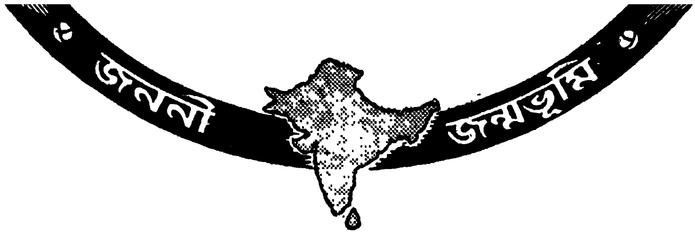
ঠাকুর—জয় মা ! জয় মা ! জয় মা ! ওরে, কে কোথায় আছিস্‌, ওরে শোন্‌, মা আমাকে পাঠিয়েছে···ওরে, মা'র কাজের জন্য মা আমাকে পাঠিয়েছে···জয় মা···জয় মা ···জয় মা···জয় মা !

কথক—তারপর থেকে সুরু হলো জগতের ইতিহাসে এক অপরূপ সাধনার লীলা। তন্ত্র থেকে আরম্ভ ক'রে, তোতাপুরীর কাছে অদ্বৈত-জ্ঞান লাভ ক'রে, ঠাকুর একে-একে নিজের জীবনে জগতের বিভিন্ন ধর্মমত প্রত্যক্ষভাবে আচরণ ক'রে, প্রত্যেকটিতেই সিদ্ধিলাভ করলেন। এইভাবে সর্ব সাধনায় সিদ্ধ হয়ে ভেদসংক্ষুব্ধ আর্ত্ত সংসারে তিনি মানব-কল্যাণের জন্য তাঁর উপযুক্ত শিষ্যের খোঁজে ব্যাকুল হলেন। তিনি জানতেন, তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর অনুচরেরাও এসেছে। সেদিন তিনি তাঁর ভক্ত সুরেনবাবুর বাড়ীতে এসেছেন,—

ঠাকুর—বলি, অ-সুরেন, তুমি যে বলেছিলে তোমাদের পাড়ায় কে একটি ছেলে ভাল গান গায়···

সুরেন—হাঁ, বহু কষ্টে তাকে নিয়ে এসেছি···ঐ যে তানপুরো হাতে ব'সে···বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে নরেন, ইয়ং-বেঙ্গল···ইংরাজী-পড়া, এসব মানতেই চায়না কি না···

ঠাকুর—(কানে-কানে) ওরে, মানবে রে মানবে, মা আমাকে বলেছে, ওরা আসবে···



সুরেন—নরেন, এই যে ঠাকুর এসেছেন···তোমার গান শোনবার জন্যেই এসেছেন ··নাও···ধর···তানপুরো···

(তানপুরার আওয়াজ)

নরেনের গান

তনয়ে তারো তারিণী (মা তারা)।
ত্রিবিধ তাপে তারা
নিশিদিন হতেছি সারা
বার বার বৃথা আর
কাঁদায়ো না অনিবার
অধম তনয়ের দুখ নাশো দুখনাশিনী ॥
রাঙ্গা ফলে ভুলিবনা মা আমি এবার
খাইয়ে দেখেছি মাগো, নাহি যে কোন স্বতার,
সে যে স্ফুরিত গরলে
খাইলে কুফল ফলে
মা হয়ে তনয়ের মুখে দিয়োনা আর জননী ॥

ঠাকুর—আহা! কি মধুর কণ্ঠ! ওরে, দেখি-দেখি তোর মুখখানা···এই তো···এই তো···দেখি তোর হাত···হাঁ···হাঁরে, তোকেই যে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি···আস্‌বি··· আসবি আমার কাছে?

নরেন—আপনার কাছে? কোথায়?

ঠাকুর—ওরে দক্ষিণেশ্বরে···আমার মাকে দেখবি···

নরেন—এসব আপনি কি বলছেন? আমার এখন কাজ আছে···আমি যাই···

ঠাকুর—ওরে, আসবি না?

নরেন—আচ্ছা, চেষ্টা ক'রে দেখবো—(স্বর মিলিয়ে গেল)



ঠাকুর—অ-সুরেন ও যে চলে গেল !

সুরেন—আজকালকার ইংরেজী-পড়া ছেলে, বুঝলেন কিনা, ওদের মেজাজই আলাদা !

ঠাকুর—ওরে, না, না ওকে আমি চিনেছি···ওকে যে আমার দরকার···অ-সুরেন, তুই বাবা ওকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সামনের রোববার ওখানে নিয়ে আস্‌বি···কথা দে !

সুরেন—আমি কথা দিচ্ছি···চেষ্টা করবো !

(দ্বিতীয় সাক্ষাৎ—দক্ষিণেশ্বরে)

নরেন্দ্রের গান

হরি, দিন তো গেল সন্ধ্যা হ'ল
পার করো আমারে।
তুমি পারের কর্ত্তা, জেনে বার্ত্তা
ডাকছি হে তোমারে ॥
আমি আগে এসে ঘাটে রইলাম বসে
যারা পাছে এলো, আগে গেল
আমি রইলাম পড়ে ॥

ঠাকুর—ওরে শোন্, উঠে আয়্···

নরেন—আমাকে বলছেন ?

ঠাকুর—হাঁরে, তোকেই ডাকছি···বাইরে আয়, তোর সঙ্গে একটু আলাদা কথা আছে·· আয়—

নরেন—এ আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ?

ঠাকুর—ওরে, এই ঘরের ভিতর, একটু নিরবিলিতে···

নরেন—একি, ঘরে খিল দিচ্ছেন কেন ?

ঠাকুর—বিষয়ী লোকের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে প্রাণটা শুকিয়ে গেল···তাই তোর সঙ্গে দুটো প্রাণের কথা বলবো···হাঁরে, এতদিন পরে আসতে হয় ?

নরেন—এ আপনি কি বলছেন আমাকে ? ওকি ! ওকি হবে ?



ঠাকুর—ওরে, তুই আসবি ব'লে, একটু সন্দেশ লুকিয়ে রেখে দিয়েছিলাম, খা· ওরে, খা···

নরেন—আমাকে দিন···আমার বন্ধুরা রয়েছে·· ওদের সঙ্গে·

ঠাকুর—না না, ওদের আলাদা দেবো'খন, তুই খা···আমি তোকে খাইয়ে দিই···



—দেখেছি কি রে, তোর সঙ্গে যে ধব করি—

নরেন—আপনি সন্নেসী মানুষ! আপনার একি কাতরতা?

ঠাকুর—ওরে, কালে তুই সব বুঝবি রে· তুই যে আমার নারায়ণ আমার মা বলছে রে···

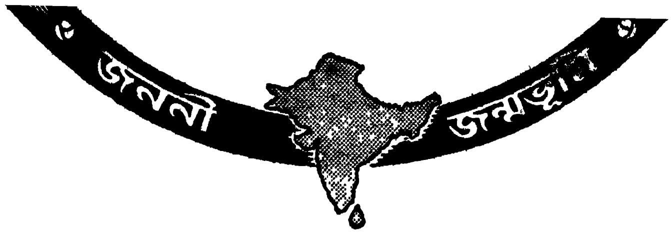
নরেন—আপনার মাকে আমি মানি না! আপনি আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন?

ঠাকুর—কি, বল্?

নরেন—আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন?

ঠাকুর—দেখিছি কি রে? তার সঙ্গে যে ধব করি, কথা বলি, এই যেমন তোর সঙ্গে কথা বলছি ···তুই দেখবি? দেখবি? আয়···আয় দেখি তোর বুকটা···

নরেন—একি! আমার শরীর···এ কি-রকম করছে? আমি যে দাঁড়াতে পারছি



ন…কই…ঘর, দোর দেওয়াল…কোথায় গেল সব…এ আমি কোথায়? এ আমি কোথায়?

ঠাকুর—এই যে আমার বুকে তুই রয়েছিস রে…দেখি-দেখি, বুকটায় একটু হাত বুলিয়ে দিই…ভয় কি? আচ্ছা…পরে আবার হবে, কেমন?

(দক্ষিণেশ্বরে ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে ঠাকুর, নরেন্দ্রনাথ ও একজন মাড়োয়ারী ভক্ত)

নরেন—বাবা, লছমীনারাণ এসেছে।

ঠাকুর—এসো, এসো লছমীনারাণ, হাতে, পুঁটলীতে ও কি আবার!

লছমী—ঠাকুরজী…থোড়া পেরণামি লে আয়া…আড়হাই শো রুপেয়া…

ঠাকুর—আরে, আরে, সরে যা, সরে যা, অ-নরেন…

লছমী—কির্‌পা করকে লেলিজিয়ে ঠাকুরজী…

ঠাকুর—অ-নরেন, ওকে পুঁট্‌লীটা নিয়ে যেতে বল্ না…না, না…আমিই এখান থেকে যাচ্ছি…উঠে আয় নরেন, আয় আমার সঙ্গে…দেখ্…টাকা আমি ছুঁতে পারি না…আঙুল বেঁকে যায়…

নরেন—আপনার সঙ্গে আজ আমার বিশেষ দরকারি কথা আছে…অতো লোকের সামনে বলতে পারছিলাম না…

ঠাকুর—এই তো নিরিবিলি…বল্

নরেন—সংসারের দারিদ্র্য আর আমি সইতে পারছি না…মা—ভাই বোন উপবাসী থাকবে আর আমি ধর্ম্মচর্চ্চা করবো, তা আমি পারবো না। তুমি বলো, তোমার মা, তুমি যাই চাইবে তাই দেবে, তবে কেন তুমি তোমার মার কাছে বলো না, যাতে আমার এই অর্থকষ্ট দূর হয়ে যায়!

ঠাকুর—এই কথা! তুই নিজেই মা'র কাছে গিয়ে চা, আমি বলছি…তুই যা চাইবি মা আমার তোকে তাই দেবে…

নরেন—আমি যা চাইবো, তাই তিনি দেবেন?

ঠাকুর—ওরে, এখনো অবিশ্বাস! বেশ, আজ তার পরখ হয়ে যাক্, এই তো মা'র



মন্দিরের দরজা খোলা, তুই ভিতরে গিয়ে একমনে মা'র কাছে চা···আমি বলছি ···তুই যা চাইবি তাই পাবি। যা, ওরে যা—জয় মা! জয় মা! আজ নরেন মা'র মন্দিরে ঢুকেছে···মাকে বিশ্বাস করেছে···জয় মা,···জয় মা···এ কী··· এরী মধ্যে ফিরে এলি? চেয়েছিলি?

নরেন—না, চাইতে পারলাম না···কে যেন গলা টিপে ধরলো···

ঠাকুর—দূর বোকা! যা, যা, আবার যা···আরে যা···মার কাছে চাইবি, লজ্জা কি? মার কাছে ছেলে সব বায়না করতে পারে রে?···যা! যা! দাঁড়িয়ে রইলি কেন? যা···মা-গো দেখিস্ মা···আজ যেন নরেন জয়ী হয়ে তোর্ কাছ থেকে ফির্‌তে পারে···ও-যেন তোকে চিন্‌তে পারে···দোহাই মা, দোহাই মা···

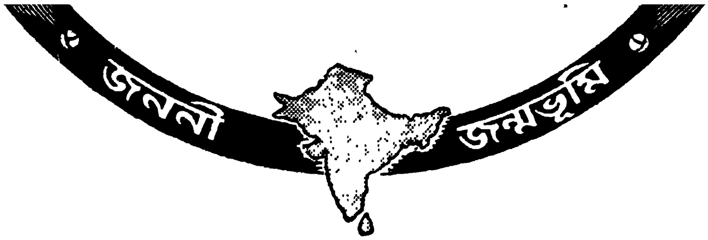
[নরেন ছুটতে-ছুটতে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসে]

নরেন—আমি বুঝেছি এ তোমার পরীক্ষা?···গুরুদেব, গুরুদেব, আর আমার ভ্রান্তি নেই···আমি দেখেছি, মা আমার জাগ্রত চৈতন্যময়ী বিশ্বরূপা বিশ্বজননী···তার কাছে কেন আমি এক মুঠো চাল চাইবো?

ঠাকুর—ওরে নরেন, আয় আমার বুকে আয়···ওরে আজ আমার কি আনন্দ, কাকে বলবো? কাকে বলবো?

নরেন—তাই মা'র কাছে চেয়েছি, মাগো, আমাকে জ্ঞান দে, ভক্তি দে···তোর অমৃত স্পর্শ দে।···

ঠাকুর—ওরে, ওরে, আজ তুই সব হারিয়ে, সব পেলি রে···তুই মাকে না পেলে আমার যে ছুটি নেই রে···ওরে ডাক, প্রাণ ভরে মাকে ডাক!···



[নরেনের গান]

মা ত্বং হি তারা
তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা
তোরে জানি মা, ও দীন দয়াময়ী
দুর্গমেতে দুঃখহরা ॥
তুমি অকুলের ত্রাণকর্ত্রী
সদাশিবের মনোহরা ॥

কথক—ক্রমশ চারদিক থেকে ভক্ত সমাগম হতে লাগল। ঠাকুরের নির্দ্দেশে নরেন্দ্রনাথকে কেন্দ্র ক'রে সাধনার মহা ধূম পড়ে গেল। ঠাকুর বুঝলেন, তাঁর কাজ শেষ, যাবার সময় হয়েছে। তাই ভক্তদের ডেকে বল্লেন—

ঠাকুর—ওরে যোগীন্, পাঁজিটা একবার দেখ্ না···আজকের তারিখ কতো হলো···

যোগীন্—২৫শে শ্রাবণ।

ঠাকুর—তার পর থেকে পড়ে যা।···

যোগীন্—২৬শে, ২৭শে, ২৮শে, ২৯শে, ৩০শে সংক্রান্তি।···

ঠাকুর—ঐ পর্য্যন্তই···থাক্।···

যোগীন্—তাহলে কি ঠাকুর, আমরা বুঝবো···

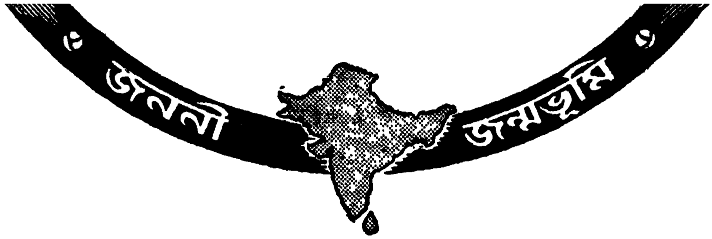
ঠাকুর—হ্যাঁরে হাঁ, যাবার সময় হলো···বাউলের দল, এলো হাসলো গাইলো, আবার চলে গেল।···

যোগীন্—মাকে বলুন না, আপনার অসুখটা সারিয়ে দিতে!···

ঠাকুর—ওরে, তা কি ক'রে হয় রে? আমার তো নিজের ইচ্ছে বলে কিছু নেই সবই তো মাকে সমর্পণ করেছি!···তাঁর ইচ্ছে না হ'লে আমি কি করবো?

যোগীন্—শুনেছি, জীবে দয়ার জন্যে!

ঠাকুর—জীবে দয়া! জীবে দয়া! কীটানুকীট, তুই জীবে দয়া করবি? দয়া করবার



কে তুই ? না, না, জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবের সেবা !···কই, নরেন···কই, এই যে বুঝলি, শিবজ্ঞানে জীবের সেবা !···

নরেন—বুঝিছি প্রভু, কিন্তু !···

ঠাকুর—আবার কিন্তু কি রে ?

নরেন—আমি যে কিছুই পেলুম না ?

ঠাকুর—কি চাস্ তুই ?

নরেন—নির্ব্বিকল্প সমাধি···মুক্তি !

ঠাকুর—ছিঃ, বারবার ঐ কথা বলতে তোর লজ্জা করে না ? এত স্বার্থপর তুই ? কোথায় কালে বৃহৎ বটের মতন বড় হয়ে শত-শত লোককে শান্তি দিবি···ছায়া দিবি···তা না তুই, নিজের মুক্তির জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিস্ ? এত ছোট তোর আদর্শ ? ওরে, ঐ দেখ্ কে আসছে, গেরুয়া আর রুদ্রাক্ষ নিয়ে,···জয় মা, জয় মা···

শিষ্য—বাবা, বড় রাখাল এই কতকগুলো গেরুয়া কাপড় আর রুদ্রাক্ষের মালা পাঠিয়ে দিয়েছেন আপনার কাছে, ভাল সন্ন্যাসী দেখে দান করবার জন্যে।···

ঠাকুর—ঠিক হয়েছে, ঠিক হয়েছে। ওরে ঠিক সময়েই মা আমার পাঠিয়ে দিয়েছে ! তোদের চেয়ে ভাল সন্ন্যাসী আর কে ? নরেন, এই গেরুয়া আর রুদ্রাক্ষ, আমি নিজের হাতে তোদের দিলাম, এই প'রে কাল তোরা ভিক্ষায় বেরুবি···বুঝলি ?

নরেন—বুঝেছি ঠাকুর ! মাথায় ক'রে নিলুম এই তোমার গেরুয়া আর রুদ্রাক্ষ !···

ঠাকুর—ওরে, তোরা সবাই মিলে সেই গানটা একবার গা না, সেই দু-ভাই-এর গান !···

[সমবেত কণ্ঠে গান]

যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে, তারা
তারা দু'ভাই এসেছে রে !
যারা মার খেয়ে প্রেম যাচে, তারা
তারা দু'ভাই এসেছে রে।



ব্রজের কানাই বলাই তারা,
তারা দু'ভাই এসেছে রে।
আচণ্ডালে কোল দেয় যারা
তারা দু'ভাই এসেছে রে।

শিষ্য—ঠাকুর, ঠাকুর, কাল রাত থেকে নরেন কি-রকম যেন হয়ে গিয়েছিল, কালীকে নিয়ে ধ্যানে বসেছিল।···

ঠাকুর—জানি, ওরে সব জানি···আমি সব দেখতে পাচ্ছি···কোন ভয় নেই···বড্ড জ্বালাতন করছিলো···যাবার আগে ওকে আমি নিশ্চিন্ত ক'রে রেখে দিয়ে যেতে চাই,···যা···তোরা একজন কেউ গিয়ে ওকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে আয়।···

শিষ্য—নরেন সত্যিই ভাগ্যবান্।···

ঠাকুর—ওরে, নরেন হলো সহস্রদল কমল···সাক্ষাৎ শিব! যেদিন ও জানতে পারবে ও কে, সেইদিনই ও চলে যাবে। তার আগে ওকে দিয়ে যে অনেক কাজ করাতে হবে···মা আমাকে যে তাই ব'লে দিয়েছে···এই যে নরেন···আয়, আয়···সাধ মিটেছে?

নরেন—মিটেছে প্রভু! আনন্দ! পরিপূর্ণ আনন্দ! একি আনন্দের স্বাদ দিলে প্রভু!

ঠাকুর—কিন্তু আর নয়—এই পর্য্যন্ত···এই আমি চাবি বন্ধ ক'রে রেখে দিলাম।··· তোর কাজ শেষ হয়ে গেলে আবার পাবি!···

নরেন—কালীকে দিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখছিলাম।—

ঠাকুর—ছিঃ, পেতে না পেতেই এত লোভ? ওরে অনেক সময় পাবি, যখন এই শক্তি তোকে কাজে লাগাতে হবে···বহু জনহিতায় জগদ্ধিতায় জগৎ জুড়ে তোকে যে অনেক কাজ করতে হবে···খবরদার, একতিল বাজে খরচ করবি না···তাই আমি চাবি দিয়ে রেখে দিলাম!···

নরেন—এতই যদি দয়া করলেন, তাহলে এত তাড়াতাড়ি আমাদের ছেড়ে।···



ঠাকুর—ওরে, জানাজানি হয়ে গিয়েছে···লোক কানাকানি করছে···তাই মা জগদম্বা এ খোলটা এবারের মতন ভেঙে দিলেন···আমি কি করি বল্? নরেন, তোর ওপর আমি এদের ভার দিয়ে গেলাম···এদের দেখবি···বুঝলি? ওরে, তোরা একটু বাইরে যা না। নরেনের সঙ্গে ছুটো লুকিয়ে কথা বলবো···ওরে নরেন, আয়··· আমার কাছে আয়, আমার বুকের কাছে, মুখের কাছে তোর কান নিয়ে···আয়, ···যাবার আগে আমার ইষ্টমন্ত্র, এই আমি তোকে দিয়ে গেলাম—রাম—রাম,—সেইসঙ্গে আমার যা-কিছু শক্তি নিঃশেষে উজাড় ক'রে এই তোকে দিয়ে গেলাম—ওরে, আজ আমি ফকীর, একেবারে ফকীর! কি, অমন ক'রে চেয়ে দেখছিস্ কি! কি নরেন···এখনো তোর সন্দেহ গেল না! এখনো তোর বিশ্বাস হলো না? যে রাম, যে কৃষ্ণ···সেই এবার একাধারে রামকৃষ্ণ!

নরেন—ক্ষমা করো প্রভু! তুমি সত্যই অন্তর্য্যামী, সর্ব্বোব্যাপী ভগবান! সত্যি এই শেষ মূহূর্ত্তে আমার মনে যে প্রশ্ন জেগেছিল···অন্তর্য্যামী প্রভু, আর আমার সন্দেহ নেই, আমি উত্তর পেয়েছি! ক্ষমা করো প্রভু, ক্ষমা করো তোমার অধম সন্তানে! আজ থেকে যতদিন দেহে প্রাণ থাকবে, সমগ্র জগতে প্রচার ক'রে বেড়াবো তোমার মহিমা···আজ থেকে আমার একমাত্র পরিচয় আমি রামকৃষ্ণ-সন্তান! জয় প্রভু! জয় রামকৃষ্ণ!

নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায় নমো।

নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায় নমো॥

সকলে—নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায় নমো।

সমাপ্ত

শুধু আমাদের কথা নয়—

'শরৎ-সাহিত্য-ভবন'-এর উপহার পুস্তকগুলি শহরের শীর্ষস্থানীয়—জনমত

—অলকনন্দা-সিরিজ—

প্রতিকপি—১৲

রত্নপুরের যাত্রী—হেমেন্দ্রকুমার রায়
বন্দী, জেগে আছো ?—প্রভাবতী দেবী সরস্বতী
রীতিমত এ্যাডভেঞ্চার—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
বর্মায় যখন বোমা পড়ে—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
...হনসিংয়ের ফাঁসী—সুমথনাথ ঘোষ
...প্ত সম্পদ—প্রভাবতী দেবী সরস্বতী
সুন্দরবনের রক্তপাগল—হেমেন্দ্রকুমার রায়
...থভোলা পথিক—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
...দান্তের দস্যিপনা—অখিল নিয়োগী
...ক্তমুখী নীলা—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
...নটা হুহু করে—সুকুমার দে সরকার
...াজকুমার জাগো—হাসিরাণী দেবী
...রের বাঘা গোয়েন্দা—হেমেন্দ্রকুমার রায়
...ঙ্গল গ্রহের বৈজ্ঞানিক—সুমথনাথ ঘোষ
...ন্দরবনে জাপানী বোম্বেটে—সুধীন্দ্রনাথ রাহা
...মধ্য সাগরের যাত্রী—প্রভাবতী দেবী সরস্বতী
...ল্লা ও ঝল্লাট—প্রভাতকিরণ বসু
...াসের প্রাসাদ—বুদ্ধদেব বসু
...কশোর অভিযান—অখিল নিয়োগী
...নরহন্তা—খগেন্দ্রনাথ মিত্র

অভিরাম-সিরিজ

প্রতিকপি—১৲

...কুল-পরী—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
...লগ্রাসে কালযবন—গৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ
...মণিমেলা—মনোজিৎ বসু
...ালপুরীর আংটি—সুধাংশুকুমার দাশগুপ্ত
...ড়ন দেশের রাজকন্যা—দীনেশ মুখোপাধ্যায়
...রীর ভূত—সুধাংশুকুমার দাস গুপ্ত
...রা তিন বন্ধু—হেমেন্দ্রকুমার রায়
...স্বয়ংবর—গৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ

—অনুবাদ-সিরিজ—

প্রতিকপি—১৲

মানুষের গড়া দৈত্য—হেমেন্দ্রকুমার রায়
স্বর্ণ-নদী—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
রুষ-গেরিলার কাহিনী—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
নাইনটী-থ্রী—সুধীন্দ্রনাথ রাহা
ছোট্ট পমির অভিযান—হেমেন্দ্রকুমার রায়
বড়দিনের বন্দনা—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
কেনিলওয়ার্থ—সুমথনাথ ঘোষ
থ্রী মাস্কেটিয়ার্স ১ম খণ্ড—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
কাউণ্ট অফ মণ্টিক্রিষ্টো—সুধীন্দ্রনাথ রাহা
রাজা আর্থার ও রথী—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
আইভ্যানহো—সুমথনাথ ঘোষ
থ্রী মাস্কেটিয়ার্স ২য় খণ্ড—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
বিদ্যালয়ে বাদল—সুধীন্দ্রনাথ রাহা
আজবদেশ লাপুটা—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
ট্যালিসম্যান—সুধীন্দ্রনাথ রাহা
সর্বেসর্বা—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
ম্যান ইন দি আয়রণ মাস্ক—সুধীন্দ্রনাথ রাহা
ইয়াহুর দেশে গলিভার—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
সিটি অফ দি সান গড (লক্ষ্মণসেনের রাজমুকুট)—সুধীন্দ্রনাথ রাহা
পার্সিয়ুস—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
সুইস ফ্যামিলি রবিনসন ১ম খণ্ড—সুধীন্দ্রনাথ রাহা
মার্কটোয়েনের গল্প—শিবরাম চক্রবর্ত্তী
হাঞ্চ ব্যাক অব নোৎরডেম—সুধীন্দ্রনাথ রাহা
টয়লার্স অফ দি সী—সুধীন্দ্রনাথ রাহা
বেনহুর ১ম খণ্ড—সুধীন্দ্রনাথ রাহা
সুইস ফ্যামিলি রবিনসন ২য় খণ্ড—সুধীন্দ্রনাথ রাহা
টোয়েন্টি ইয়ার্স আফটার ১ম খণ্ড—সুধীন্দ্রনাথ রাহা